গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৫ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ৭ - ১৩ জুন, ২০১৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

যুবকদের চাকরি দিতে না পারলে
ইউরোপে বিপ্লবের আগুন জ্বলে যাবে
আতঙ্কিত জার্মানির আর্তনাদ

ইউরোপের অর্থনৈতিক সঙ্কটকে কেন্দ্র করে জনরোষ, বিশেষত বেকার যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমেই বাড়তে থাকা ক্ষোভ ও ক্রোধ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনেতাদের হৃদকম্প ধরিয়ে দিয়েছে।

জার্মানির ভীত অর্থমন্ত্রী উল্ফগাং শ্যবেল ২৮ মে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, যুবকদের বেকার সমস্যার সমাধান করতে আমরা যদি ব্যর্থ

হই, তবে সমগ্র ইউরোপ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। আর কঠোর ব্যয়সংকোচের রাস্তায় গিয়ে ইউরোপের জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মডেল বাতিল করা হলে তা বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দেবে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যুবসমাজের মধ্যে বেকারত্ব ব্যাপক হারে বেড়েছে, প্রতি চারজন যুবকের মধ্যে একজন বেকার। যুবসম্প্রদায় মনে করছে তাদের আর চাকরি হবে না। এই পরিস্থিতিই দুশ্চিন্তায় ফেলেছে জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন ও ইটালির শাসকদের। এরা

দুয়ের পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত কি গ্রামীণ মানুষের হাতে ক্ষমতা দিয়েছে?

পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এ সময়ে পঞ্চায়েত নিয়ে কিছু কথা আবার ভেবে দেখা দরকার। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় এবং পরবর্তীকালেও শাসনকর্তারা বলেছেন, এই ব্যবস্থা গ্রামীণ জনগণের হাতে ক্ষমতা দেবে, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার বদলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাবে। আজ আর একটা নির্বাচনের মুখে বাস্তবটা কী দাঁড়িয়েছে, দেখা দরকার।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মানুষ কেমন ক্ষমতা পেয়েছে তা এ রাজ্যের গ্রামগুলির দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রতিদিন হাজার হাজার নর-নারী গ্রাম ছেড়ে শহরে, অন্য রাজ্যে পাড়ি জমায় কাজের খোঁজে। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে সরকার নাকি লোক পায় না। অথচ কাজের খোঁজে গ্রামের মেয়েরা রাত থাকতে কলকাতায় ছোটে গৃহস্থালীর কাজের আশায়, অসংখ্য গ্রামীণ মানুষ প্রতিদিন শহরের মোড়ে মোড়ে, স্টেশনগুলিতে দাঁড়িয়ে থাকে কিছু কাজ পাবার জন্য। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ দিন দিন কমছে। বন্ধ গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সামান্য পেটের অসুখ-জ্বরের চিকিৎসার জন্যও মানুষকে ছুটতে হচ্ছে দূর দুরান্তের হাসপাতালে। কৃষিক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির অবাধ অনুপ্রবেশের ফলে সার, বীজ, কীটনাশক সমস্ত কিছুরই আকাশছোঁয়া মূল্য। সরকারি সেচ প্রায় নেই। গ্রামীণ মানুষ নিজ উদ্যোগে স্যালো বা ডিপটিউবওয়েল পাম্প চালিয়ে সেচের যতটুকু বন্দোবস্ত করেছেন তার বিদ্যুৎ এবং ডিজেলের দাম বেড়েছে ভয়াবহভাবে। কৃষিপণ্যের পাইকারি এবং খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ ফড়ে-মহাজনদের কারসাজির ফলে চাষি এমনিতেই ফসলের দাম পাচ্ছে না। এর উপর কৃষিপণ্যের ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অবাধ অনুপ্রবেশের ফলে চাষির অবস্থা আরও শোচনীয় হচ্ছে দিনকে দিন। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলগুলি ধুঁকছে, গ্রামের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রথা বহির্ভূত প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রকেই মূল করে তোলা হয়েছে। বহু গ্রামে এখনও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়নি। সমস্ত গ্রামে আজও বিদ্যুৎ পৌঁছাল না। সরকার ভাত দিতে পারে না, কিন্তু গ্রামের মানুষ মোটরভ্যান চালিয়ে পেট চালানোর চেষ্টা করলে তাদের জীবিকাকে বেআইনি বলে বন্ধ করতে পুলিশ লেলিয়ে দেয়।

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের ক্ষমতায়ন হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি-র মতো দলগুলি যতই প্রচার করুক বাস্তবে গ্রামীণ গরিব মানুষ, দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী গ্রামীণ জনগণ নতুন একদল কায়েমী স্বার্থবাজদের হাতে বন্দি হয়েছে। গ্রামীণ মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু, দৈনন্দিন বেঁচে থাকা অনেকটাই পঞ্চায়েত বাবুদের দয়ার উপর নির্ভরশীল। গ্রামে গ্রামে কথাই চালু আছে

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভিতরের পাতায়

- অন্যায়-অবিচার চলবে, আর প্রতিবাদ হবে না?
- দলে দলে মানুষ গ্রাম ছাড়ছে কেন?

এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকা খরচ বিষয়ে সাংসদ তরুণ মণ্ডল

২৩ মে বর্তমান পত্রিকায় 'এলাকা উন্নয়নের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা তুলতে পারেননি ৩২ জন এম পি' এই শিরোনামে প্রকাশিত একটি সংবাদ সম্পর্কে কয়েকটি কথা পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের জ্ঞাতার্থে জানানো দরকার মনে করেই আমার এই লেখা।

অনেকেরই হয়ত জানা নেই, এম পি-দের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকা দিল্লি থেকে আনানো, অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা, খরচ করা, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট (ইউ সি) জমা দেওয়া, অডিট করানো এবং সময়ে দিল্লিতে রিপোর্ট

সংসদীয় এলাকা বাসন্তীর মানুষের সাথে সাংসদ তরুণ মণ্ডল

পাঠানোর ব্যাপারে এম পি-দের কোনও হাত নেই। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব জেলা কর্তৃপক্ষের বা কর্পোরেশনের মধ্যে পড়লে কমিশনারের। তাই, কেন্দ্রীয় সরকার এম পি এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকার সামগ্রিক দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে ডি এম/কালেক্টরেট/কমিশনার/ডেপুটি কমিশনার প্রভৃতি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উপর। তাদেরই তাই 'নোডাল অফিসার' বলা হয়। এলাকা উন্নয়ন তহবিল সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশাবলী মেনে সাংসদ শুধুমাত্র এলাকাভিত্তিক কাজের নির্দিষ্ট স্কিম, সম্ভাব্য খরচ, রূপায়ণকারী এজেন্সি (এক্সিকিউটিং এজেন্সি)-র নাম প্রতি বছর নোডাল অফিসারের অফিসে জমা দিতে পারেন। অর্থাৎ এম পি শুধু প্রস্তাবক বা রেকমেন্ডিং অথরিটি। সারা ভারতেই এই নিয়ম। নোডাল অফিসার যদি দেখেন এম পি-র প্রস্তাবিত স্কিম নির্দেশাবলী মেনে হয়নি বা প্রস্তাবিত রূপায়ণকারী এজেন্সি সেই কাজের যোগ্য নয়, তা হলে তিনি তা বাতিল করতে পারেন। তবে তা প্রস্তাব জমা দেওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে এম পি-কে জানাতে হবে এবং পরিবর্তিত প্রস্তাব চেয়ে নিতে হবে। প্রস্তাব দেওয়ার ৭৫ দিনের মধ্যে ডি এম অনুমোদন দেবেন। তাই তিনিই স্যাংশনিং অথরিটি।

এটা ঠিক যে, এম পি যদি নির্দিষ্ট সময়ে এলাকা উন্নয়নের কাজের প্রস্তাব জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা না দিতে পারেন তা হলে অবশ্যই তা এম পি-র 'ব্যর্থতা' বা 'অক্ষমতা'। পশ্চিমবাংলার প্রায় প্রত্যেক এম পি-ই চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত (২০১২-২০১৩), অনেকে পঞ্চম বর্ষেরও আংশিক কাজের প্রস্তাব জমা করে দিয়েছেন। আমার নিজের ক্ষেত্রে বলতে পারি, আমি গত ২৯-০১-'১৩ পর্যন্ত ১৪.৪৩ কোটি টাকার কাজের প্রস্তাব দিয়েছি এবং ডি এম তার মধ্যে থেকে ১৪.৩৮ কোটি টাকার কাজের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছেন। তাই সাংসদ তহবিল সম্পর্কিত আমার এক্তিয়ার অনুযায়ী এখানে ব্যর্থতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

দ্বিতীয় কথা হল, জেলা কর্তৃপক্ষ কাজের রূপায়ণকারী এজেন্সিকে অনুমোদনপত্র দেওয়ার পর রূপায়ণকারী এজেন্সি ও জেলা কর্তৃপক্ষের মধ্যে কাজের যাবতীয় বিষয়ে আদান প্রদান চলে। রূপায়ণকারী এজেন্সি অনুমোদিত স্কিম ও সম্ভাব্য খরচ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ খতিয়ে দেখে বা ভেটিং

ছয়ের পাতায় দেখুন

লোকসানের জন্য নয়, মুনাফা বাড়াতেই বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি

বিদ্যুতের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার রাজ্যের সাধারণ মানুষ। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, বিদ্যুতের প্রয়োজনীয় খরচটুকু করতেও পাঁচবার ভাবতে হচ্ছে। অথচ বর্তমান জনজীবনে সভ্যতার অপরিহার্য সামগ্রী বিদ্যুৎ। ফলে বিদ্যুতের অস্বাভাবিক ব্যয় মেটাতে ছাঁটতে হচ্ছে খাদ্য-চিকিৎসার মতো অন্যান্য অপরিহার্য বিষয়গুলির বরাদ্দ। সাধারণ মানুষের জীবনে পরিস্থিতি যখন এমন আকার নিয়েছে, তখন ঠিক এর বিপরীত চিত্রটি দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎ নিয়ে ব্যবসার ক্ষেত্রে। বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের মুনাফা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

২০১২-১৩ অর্থবর্ষে সিইএসসি-র নিট মুনাফা বেড়েছে ১২ শতাংশ। আগের বছরের ৫৫৪ কোটি টাকার জায়গায় এবার হয়েছে ৬১৯ কোটি টাকা। ২৮ মে সংস্থার চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলেছেন, এই আর্থিক ফলাফলে আমরা খুশি। শেয়ার হোল্ডারদের জন্য শতকরা ৭০ শতাংশ ডিভিডেন্ড দেবার কথা তাঁরা ভাবছেন। এটাকে সিইএসসি-র ইতিহাসে রেকর্ড বলে তিনি অভিহিত করেছেন। সাথে সাথে তিনি গত দু'বছরে কয়লার দাম বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এ কথা বলে তিনি পুনরায় বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির আগাম বার্তা দিতে চাইছেন কি? প্রশ্ন হল, সিইএসসি-র লাভ যেখানে বিপুল থেকে বিপুলতর হচ্ছে, সেখানে বছরে দুই-তিন বার করে বিদ্যুতের দাম বাড়ছে কেন? গ্রাহকরা বিদ্যুতের বাড়তি মাশুল দিতে অপারগ হলেও কোম্পানির লোকসানের অজুহাত দিয়ে তাদের তা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে কেন? আর এক্ষেত্রে সিইএসসি-র নির্দেশনামায় সরকারি শিলমোহরই বা পড়ছে কীভাবে? হলদিয়ায় নতুন বিদ্যুৎ প্রকল্প, মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুরে বা রাজস্থানের জয়সলমিরে নিত্যনতুন বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধনই বা সিইএসসি করে চলেছে কীভাবে? একদিকে কয়লার দাম বৃদ্ধি, অপরদিকে লোকসানের গল্প শুনিয়ে দাম বৃদ্ধির অজুহাত খোঁজার চেষ্টা যে তাদের পূর্বপরিকল্পিত, তা অত্যন্ত পরিষ্কার। বিগত সিপিএম সরকার কলকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিয়েছিল। বর্তমান সরকারও গোয়েঙ্কা কর্তাদের আরও লাভের উদ্দেশ্যে বারবার মাশুল বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়ে চলেছে।

মেদিনীপুর কলেজে ফি-বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের জয়

২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রদের টিউশন ফি-র ৫০ শতাংশ টাকা রাজ্য সরকারের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষগুলিকে। এই অজুহাতে কয়েকদিন আগে মেদিনীপুর কলেজ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিষয়ে ৪৬০ টাকা থেকে ১০১০ টাকা পর্যন্ত ফি বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ ইলেকট্রিসিটি ফি ১০০ টাকা থেকে ২২০ টাকা, ইউনিয়ন ফি ৬৯ টাকা থেকে ১০০ টাকা, ডেভেলপমেন্ট ফি ৫০ টাকা ও লাইব্রেরি ফি ৫০ টাকা বৃদ্ধি করে। ফর্মের দাম ৫০ টাকা থেকে ১০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নেয়। কর্তৃপক্ষের এই অগণতান্ত্রিক ও ছাত্রস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে ডি এস ও বিক্ষোভ সংগঠিত করে। সাধারণ ছাত্রছাত্রী সহ সর্বস্তরের মানুষ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১ জুন ডি এস ও-র এক প্রতিনিধি দল কলেজের টিচার ইনচার্জকে ডেপুটেশন দেয়। আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে এবং ফর্মের দাম অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

আতঙ্কিত জার্মানি

একের পাতার পর

কতটা ভীত, বোঝা যায় যখন ২৮ মে প্যারিসের এক সাংবাদিক সম্মেলনে জার্মানির অর্থমন্ত্রী বলেন, কল্যাণমূলক ব্যবস্থাগুলিতে ব্যাপক ছাঁটাই করা হলে, "ইউরোপে আমরা বিপ্লব ঘটতে দেখব, এবং সেটা আগামীকাল নয়, আজ এখনই ঘটে যাবে।"

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী মারিয়ানো রাজয় অবাক করার মতো কথা বলেছেন। বেকার যুবকদের সংখ্যা সেখানে সর্বোচ্চ — ৫৭ শতাংশ। মন্দার প্রকোপে লে-অফ বা ছাঁটাই এখনও অব্যাহত। আতঙ্কিত প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ — ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলির জন্য সরকারি অর্থসাহায্য তিনগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হোক, চাকরিতে যুবকদের নিয়োগ করার শর্তে কোম্পানিগুলিকে যেন সরকার বিশেষ ভরতুকি দিতে পারে, তার জন্য অনুমতি দেওয়া হোক। বোঝাই যায়, ইউরোপের দেশগুলিতেও বড় বড় শিল্পে এখন লালবাতি জ্বলছে। পর্তুগালে অনূর্ধ্ব ২৫ বছরের যুবকদের মধ্যে মার্চ মাসে বেকারির হার ৪০ শতাংশ। ফেব্রুয়ারিতে গ্রীসে বেকারির হার ছিল ৬৪ শতাংশ।

জার্মানির শাসকদের ভয় বেশি, তার কারণ, আর্থিক শক্তিতে জার্মানিই এখন ইউরোপের শীর্ষে। এবং এ কথাও জনগণ জানে, ইউরোপের সংকট জর্জরিত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সরকারি ব্যয়সংকোচের যে খড়্গ জনসাধারণের ঘাড়ে কোপ মেরেছে, সেই ব্যয়সংকোচের প্রধান প্রবক্তা হচ্ছে জার্মানি এবং তার চাপই কাজ করছে অন্যদের উপর। অথচ জার্মানিতে বেকারের হার মাত্র ৮ শতাংশ। এটাও বাড়ছে। খোদ জার্মানির আকাশেই কালো মেঘ, ফ্রাঙ্কফুট শহরের বিশাল যুব বিক্ষোভ কাঁপিয়ে দিয়েছে শাসকদের। ফলে, জার্মানি ভয় পাচ্ছে, গোটা ইউরোপে জনবিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠলে জার্মানি রেহাই পাবে না।

ইটালির প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের বিরাট অংশ আজ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে, এদের রক্ষা করতে হবে আমাদের।"

এ সব সন্ত্রস্ত এক রাষ্ট্রনায়কের বিলাপ ছাড়া কিছু নয়। কারণ কী দিয়ে রক্ষা পাবে আজকের সংকটজর্জরিত পুঁজিবাদী অর্থনীতি? স্থায়ী মন্দার গহ্বর থেকে তাকে টেনে তুলবে কে?

প্যারিসের বৈঠকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে কর্তারা বসেছিলেন, এক স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর ঐ একটি সুপারিশ ছাড়া অন্য কেউ কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দিতে পারেননি। উল্টে ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কের প্রধান ওয়র্নার হয়ার বলেছেন, "সত্যটা আমাদের স্বীকার করা দরকার। সংকট কাটাবার কোনও চটজলদি সমাধান নেই। কোনও দারুণ পরিকল্পনা আমাদের হাতে নেই।"

এভাবেই প্যারিস বৈঠক শেষ হয়েছে। জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল আবার একটি বৈঠক ডেকেছেন ৩ জুলাই বার্লিনে। বেকার সমস্যা সমাধানের 'দাওয়াই' বাতলাতে শ্রমমন্ত্রীদের যোগ দিতে বলেছেন সেই সভায়।

আজ আবার কমিউনিস্ট ইস্তাহারে মার্কস-এঙ্গেলসের সেই বিখ্যাত ঘোষণা স্মরণ করে বলাই যায়— বিপ্লবের আতঙ্ক তাড়া করছে ইউরোপকে।

-রয়টার্স নিউজ

বিশিষ্ট পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা ও সবং এলাকার এস ইউ সি আই (সি)-র বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড ভক্তি দে (৬২) দীর্ঘ ১৪ বছর দুরারোগ্য পারকিনসনস অসুখে অসুস্থ থাকার পর গত ১৬ মে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

কমরেড ভক্তি দে রাজনৈতিকভাবে একদা সিপিআই(এম) দলের সংস্রবে ছিলেন। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি পুস্তিকা তাঁর চিন্তায় আলোড়ন তোলে। এই বইটি পেয়ে তিনি গোটা রাত ধরে বারবার সেটি পড়েন এবং তখনই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এ দেশে শোষিত মানুষের মুক্তিপথের সন্ধান কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার মধ্যেই রয়েছে। এরপরই তিনি এস ইউ সি আই (সি) দলের কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সংসারে অভাব-অনটন, চাকরির প্রস্তাব, নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা কোনও কিছুই তাঁকে আটকাতে পারেনি। পিংলা-সবং অঞ্চলে সে সময় পার্টির নামই প্রায় কেউ জানত না, থাকা-খাওয়ার জায়গা ছিল না। এর মধ্যেই নিরলস প্রচেষ্টায় তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা ও আদর্শ বহন করে নিয়ে গেছেন ছাত্র-যুবকদের কাছে। তাঁর সাহচর্যে একটি একটি করে ছাত্র ও যুবক দলের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে পার্টির কর্মীতে পরিণত হয়েছে। এঁদের মধ্যে অনেকেই এখন পার্টির বড় দায়িত্ব পালন করছেন। শিক্ষা আন্দোলন, ভাড়াবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন সহ বহু আন্দোলনে তিনি নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছেন। নেতৃত্ব যখনই কোনও দায়িত্ব দিয়েছেন, তিনি ঘাটাল সহ মেদিনীপুর জেলার যে কোনও প্রান্তেই হোক ছুটে গিয়েছেন তা পালন করতে। প্রায় ১৪ বছর আগে তাঁর শরীরে পারকিনসনস রোগ ধরা পড়ে। দুরারোগ্য এই ব্যাধির প্রকোপ ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে চলাফেরা করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তবুও তিনি ঐভাবেই পার্টির বৈঠকে যেতেন, জরুরি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে জেলা জুড়েই দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর শেষযাত্রায় দলের নেতা-কর্মীরা ছাড়াও গ্রামের মানুষজন যোগ দেন।

প্রয়াত কমরেড ভক্তি দে-র স্মৃতির প্রতি বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জানাতে ২৩ মে ধনেশ্বরপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসুর লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতি। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড পঞ্চানন প্রধান।

কমরেড ভক্তি দে লাল সেলাম

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

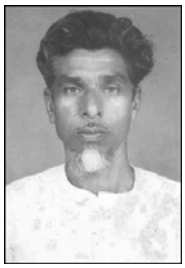

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার নিকারিঘাটা দাঁড়িয়া অঞ্চলের রামামারী গ্রামের পার্টির আবেদনকারী সদস্য কমরেড কাজেম আলি লস্কর ২৩ মে আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

কমরেড কাজেম আলি লস্কর ১৯৬৭ সালে চাষি আন্দোলনের মাধ্যমে এস ইউ সি আই (সি)-র সংস্পর্শে আসেন এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে নিজেকে দলের কর্মী হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি সাধারণ মানুষের যেকোনও সমস্যায় নিজেকে নিয়োজিত করতেন। সিপিএম এবং কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহলের চাপের কাছে কোনও দিন নতি স্বীকার করেননি। তিনি তাঁর পরিবারকেও দলের সমর্থকে পরিণত করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষ তাঁর বাড়িতে ছুটে আসেন এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারাল।

কমরেড কাজেম আলি লস্কর লাল সেলাম

ভুবনেশ্বরে উচ্ছেদবিরোধী কনভেনশন

৩১মে ভুবনেশ্বরে এস ইউ সি আই (সি) ও অন্যান্য বামপন্থী দলের উদ্যোগে বহুজাতিক পস্কোর জমি অধিগ্রহণ ও উচ্ছেদ বিরোধী কনভেনশন

অন্যায়-অবিচার চলবে, আর প্রতিবাদ হবে না?

অনেকেই বলছেন, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। কিন্তু রামায়ণেও লঙ্কায় গিয়ে কেউ রাবণ হয়নি। তাই ও কথা বলা চলে না। বরং বলা ভালো, সমাজব্যবস্থা হিসাবে অচল হয়ে যাওয়া, দুর্নীতি আর অসাম্যে পরিপূর্ণ এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে যারাই টিকিয়ে রাখতে চায়, চরম দুর্নীতিতে নিমজ্জিত মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে যারাই কাজ করে তাদেরই জনস্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে হয়। অতীতে কংগ্রেসি শাসকদের ক্ষেত্রে এ জিনিস ঘটেছে, সিপিএম দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে একই কাজ করেছে, তৃণমূল শাসনেও একই জিনিস ঘটেছে।

সম্প্রতি রাজ্য প্রশাসন ফতোয়া জারি করেছে, রাজধানী কলকাতার নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় সভা-সমাবেশ করা যাবে না এবং কলকাতার মূল এলাকায় আইন-অমান্য আন্দোলনও করা যাবে না। এই ফতোয়া জারি করা হয়েছে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তড়িঘড়ি তলব করা লালবাজারে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের এক সর্বদলীয় সভাতে। উল্লেখ্য, গত ১৪ মে এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই এম এস এস-এর পক্ষ থেকে চিটফান্ড দুর্নীতি বন্ধ, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল চালু করা এবং মহিলাদের উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণ বন্ধের দাবিতে যে আইন অমান্যের ডাক দেওয়া হয়েছিল তা একদিকে যেমন জনমনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে তেমনই প্রশাসনের উপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। সেই আন্দোলনে পুলিশ নির্বিচারে লাঠিচার্জ করে। শতাধিক ছাত্র-যুব-মহিলা আন্দোলনকারী আহত হন। পুলিশ সাত জন ছাত্র কর্মীকে গ্রেপ্তার করে এবং 'খুনের চেষ্টা'র অভিযোগ এনে হাজতে আটকে রাখে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা এ ভাবে শৃঙ্খলা ভেঙে আইন অমান্য আন্দোলন করবে, ভবিষ্যতে তাদের এই ধরনের আন্দোলন করার অনুমতি দেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে। তারপরই তড়িঘড়ি এই বৈঠক। বৈঠকে এস ইউ সি আই (সি) পুলিশের এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, রাজ্য জুড়ে ক্রমবর্ধমান চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-খুন-ধর্ষণ-পথেঘাটে মহিলাদের উপর আক্রমণের ঘটনাগুলিকে কি পুলিশ আইনশৃঙ্খলার অবনতি বলে মনে করে না? পরিবর্তে এগুলি বন্ধের দাবিতে সভা-সমাবেশ-আইন অমান্য আন্দোলনই কি তাদের কাছে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল? অন্যান্য বিরোধীদলগুলিও পুলিশের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। যদিও সিপিএম ক্ষমতায় থাকার সময়ে একইভাবে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ বন্ধের অপচেষ্টা চালিয়েছে। বিরোধী দলগুলির এই আপত্তিকে অগ্রাহ্য করেই পুলিশ এ সম্পর্কে নির্দেশিকা জারি করে দিয়েছে। কিন্তু কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার, যাদের ক্ষমতায় আসার পিছনে রাজ্যের মানুষের দীর্ঘ আন্দোলনের ভূমিকা রয়েছে, তারা এমন একটি চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক এবং স্বৈরাচারী ঘোষণা তড়িঘড়ি করে ফেলল?

পুলিশ কর্তারা অবশ্য বলেছেন, কলকাতা পুলিশের বর্তমান পরিকাঠামোয় আইন অমান্য আন্দোলন সামাল দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সামাল দেওয়ার ক্ষমতা মানে কী? লাঠি চালানোর ক্ষমতা? গুলি চালানোর ক্ষমতা? সে ক্ষমতার অভাব তো পুলিশের কখনও হয়নি। তা ১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্টের খাদ্য আন্দোলনে হোক, বা ১৯৯০ সালের ৩১ আগস্টের কর-দর-মূল্যবৃদ্ধি, বাসভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনেই হোক। আর যদি আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতার কথা বলা হয়, তবে তো শত শত আইন অমান্যের কর্মসূচিতে পুলিশ সে ক্ষমতা দেখিয়েছে। ফলে ক্ষমতার অভাবের যুক্তি ধোপে টেকে না।

সরকারের এই সিদ্ধান্তে মালিকদের মুখপাত্র এবং মুখপত্রগুলি যারপরনাই উল্লসিত। এস ইউ সি আই (সি)-র মতো বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই সিদ্ধান্তকে অগণতান্ত্রিক বলায় তাদের কেউ কেউ এমনও বলেছে, রাস্তা গণতন্ত্র অনুশীলনের সঠিক জায়গা নয়। তার জন্য আইনসভা রয়েছে।

বিধানসভা, লোকসভা প্রভৃতি আইনসভাগুলি কি গণতন্ত্র তথা জনস্বার্থ রক্ষার কাজ করছে? কোনও দিন করেছে? স্বাধীনতার পর কিছুদিন পর্যন্ত এগুলির গণতান্ত্রিক ভড়ং হলেও কিছুটা ছিল, আজ আর তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। আজ আইনসভাগুলি মালিকদের তথা কর্পোরেট হাউসগুলির স্বার্থরক্ষার মঞ্চে পরিণত হয়েছে। সরকারি হিসাবেই লোকসভা সদস্যদের ৩০০ জন কোটিপতি। বাস্তবে এই সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি। এই সমস্ত কোটিপতিরা আইনসভায় দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য সওয়াল করবে, এটা কখনও হতে পারে? তা হলে প্রতিটা অধিবেশনে গণ্ডায় গণ্ডায় জনস্বার্থ বিরোধী

আইন পাশ হচ্ছে কী করে? উদারিকরণ, বেসরকারিকরণ, জনগণের জন্য ভরতুকি ছাঁটাই, এস ই জেড আইন, ব্যাঙ্ক-বিমার বেসরকারিকরণ, পেনশন ফান্ডের বেসরকারিকরণ প্রভৃতি সবই তো জনস্বার্থের বিরুদ্ধে। আইনসভাতেই তো তার সদস্যরা হাসতে হাসতে এই আইনগুলি পাশ করিয়েছেন। খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজির ছাড়পত্র কি জনস্বার্থে? আবার, নির্বাচন এবং সাংসদদের পিছনে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা খরচ হলেও দেখা যায়, হয় সাংসদরা অনুপস্থিত, না হয় কোনও রকম বিতর্ক ছাড়াই একের পর এক আইন পাশ হয়ে যাচ্ছে। এই আইনসভা দিয়ে কি জনস্বার্থ রক্ষা সম্ভব? আইনসভাতেও সদস্যদের যদি কিছুমাত্র জনস্বার্থের কথা ভাবাতে হয় তবে তার জন্যও প্রয়োজন তার বাইরে রাস্তার আন্দোলনের চাপ। যেমন দিল্লিতে সাম্প্রতিক ছাত্র-যুবদের আন্দোলনের ফলেই সরকার তড়িঘড়ি মহিলাদের উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণ প্রতিরোধে আইন আনতে বাধ্য হয়েছে।

পুঁজিপতিরা যাকে 'গণতন্ত্র' বলে, তা আসলে 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র'। অর্থাৎ শুধু মাত্র মালিকদের জন্যই গণতন্ত্র। বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থাটিকেও তারা যতই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলুক, আসলে তা একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্র। কিন্তু এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উদ্ভবই বা কোথায় হয়েছিল? কোনও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুসজ্জিত সভা ঘরে? না। একেবারে রাস্তায়। যে ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উদ্ভব, সেই ফরাসি বিপ্লবে বুরবোঁ রাজতন্ত্রের পতন হয়েছিল যে 'বাস্তিল দুর্গ পতনের' মধ্য দিয়ে, তা ছিল শোষিত বঞ্চিত মানুষের একেবারে রাস্তার লড়াই। সেই লড়াইয়ের ফলেই রাজসভার পরিবর্তে আইনসভা গড়ে ওঠে। এই সব ইতিহাস এই মুখপাত্রদের জানা নেই, তা নয়। আসলে সেদিন বুর্জোয়াদের নিজেদের প্রয়োজনেই রাজতন্ত্রের পতনের প্রয়োজন ছিল। তাই সেদিন তাঁরা রাস্তার লড়াইয়ের সমর্থক ছিলেন। বুর্জোয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বুর্জোয়া একাধিপত্য অনড় হয়ে বসেছে, তাদের পুঁজির পাহাড় গগনচুম্বী আকার ধারণ করেছে। বিপরীতে তাদের সীমাহীন শোষণে জর্জরিত সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ছে, উপড়ে ফেলতে চাইছে বুর্জোয়া-স্বার্থরক্ষার এই সমাজটাকেই। তাই বুর্জোয়ারা আজ রাস্তার লড়াইয়ের ঘোরতর বিরোধী। তাঁরা আজ তা আটকাতে চায়। প্রয়োজনে পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে, মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ভরে, ফতোয়া জারি করে, আইন পাল্টে— যে করে হোক। তাই মুখ্যমন্ত্রীর এই ফতোয়া।

অথচ ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সময়েই হোক, বা আজ যখন বুর্জোয়ারা গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরেছে তখনই হোক, কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূ শাসকদের বিরুদ্ধে জনস্বার্থের লড়াইয়ে রাস্তার আন্দোলন সমান প্রাসঙ্গিক। গোটা বিশ্বজুড়ে শোষিত, বঞ্চিত মানুষ আজ পথে নেমেছে। দেশে দেশে গণআন্দোলনের জোয়ার বইছে। আন্দোলনের চাপে একের পর এক দেশে স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটছে। সর্বত্রই আন্দোলন বন্ধের সরকারি ফতোয়াকে হেলায় অগ্রাহ্য করেছে মানুষ। রাজ্যে সাম্প্রতিক যে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় বসেছেন, তা কি বিধানসভার বিতর্ক বা কোনও হলে বসা সভার ফল? নাকি দীর্ঘ সিপিএম শাসনের শোষণ, অত্যাচার, নির্যাতন, যে কোনও বিরোধী কণ্ঠের টুঁটি চেপে ধরার পরিণতিতে রাস্তায় সিপিএমের ভাড়াটে ক্রিমিনাল এবং পুলিশবাহিনীর বিরুদ্ধে শোষিত-বঞ্চিত-বিপন্ন মানুষের জীবনপণ লড়াইয়ের ফল। ২০০৭ সালে নন্দীগ্রামে গণহত্যার পর ১৪ নভেম্বর মহানগরীতে যে মহামিছিলে রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-যুবক, শ্রমিক-কৃষক সামিল হয়েছিলেন, যা রাজ্য রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল, তা কি রাস্তার আন্দোলন ছিল না? এ জিনিস কি শুধু আইনসভার বক্তৃতায় সম্ভব হত? সিপিএম শাসনে রাজ্যের মানুষের যত ক্ষতি হয়েছে তার মধ্যে গুরুতর হল শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজি ও পাশফেল তুলে দেওয়া। এই সিদ্ধান্তও সিপিএম নেতারা শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তা বিধানসভায় বিতর্কের ফলে নয়। এস ইউ সি আই (সি)র নেতৃত্বে দীর্ঘ ১৯ বছর এক লাগাতার গণআন্দোলনের ফলে যে জনমত গড়ে উঠেছিল তার চাপে। এই আন্দোলনের অধিক অংশই হয়েছিল রাস্তায়— যেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন সুকুমার সেন, প্রমথনাথ বিশী, নীহাররঞ্জন রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রতুল গুপ্ত, শৈলেশ দে, সুশীল কুমার মুখার্জীর মতো রাজ্যের প্রথম সারির প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সকলেই। শুধু তাই নয়, তাঁরা আইন অমান্য করে জেলেও গিয়েছিলেন। নির্বিচারে কৃষিজমি দখলের বিরুদ্ধে গোটা দেশজুড়ে আজ এক অভূতপূর্ব গণজাগরণ গড়ে উঠেছে। এই জাগরণ নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়ে যে আন্দোলন ফেটে পড়েছিল তারই ফল। বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় ব্যাপক বেসরকারিকরণের ফলে মালিকদের স্বেচ্ছাচারিতায় লাফিয়ে লাফিয়ে দাম বাড়ছে বিদ্যুতের। তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শক্তি হিসাবে আজও যা দাঁড়িয়ে আছে তা কোনও ঠাণ্ডা ঘরের নিরুত্তাপ বাক্যালাপ নয়, 'অ্যাবেকার' নেতৃত্বে শক্তিশালী গ্রাহক আন্দোলন। সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার এখনও যতটুকু টিকে রয়েছে তারও অনেকখানিই জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের ফল। সবই দেখাচ্ছে, লোকসভা, বিধানসভা নয়, জনসাধারণের বেঁচে থাকার স্বার্থ যতটুকু রক্ষা করা গেছে, তা রাস্তায় গণআন্দোলনের ফলেই। আর, এ জন্যই সব শাসকরা রাস্তার আন্দোলনকে ভয় পায়। তাকে আটকানোর ফন্দি আঁটে।

আজ সিপিএম নেতারা যতই সাধু সাজার চেষ্টা করুন, তাঁদের রাজত্বে তাঁরা ঠিক এই কাজই করেছিলেন। মালিকদের সুরেই গলা মিলিয়ে তাঁরাও মিটিং-মিছিলকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে মালিকদের সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তার গালভরা নাম দিয়েছিলেন 'রিজেনেবল রেস্ট্রিকশন'। প্রস্তাব দিয়েছিলেন মিছিল-মিটিং ছুটির দিনে করতে হবে, মিছিল চলবে রাস্তার এক ধার দিয়ে, শহরের কেন্দ্রস্থলে সভা করা যাবে না। ২০০৩ সালের ২৯ অক্টোবর মহাকরণে এই উদ্দেশ্যে তাঁরাও একটি সর্বদলীয় সভা ডেকেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সেই সভা বয়কট করেছিল। সেই সিপিএমই আজ ক্ষমতা হারিয়ে 'বিপ্লবী' সাজতে শুরু করে দিয়েছে। অবশ্য এই মেকি বিপ্লবীদের হাতের তলোয়ার যে আসলে টিনের তা বুঝতে মানুষের কোনও অসুবিধা হয়নি।

তৃণমূল নেত্রী যতই নিজেকে মা-মাটি-মানুষের প্রতিনিধি বলুন, বাস্তবে ক্রমশ তাঁর জনস্বার্থবিরোধী চরিত্রটি পরিষ্কার হয়ে উঠছে। আসলে 'সংস্কারের' নামে সাধারণ মানুষের উপর পুঁজিপতি শ্রেণি ও সরকারের আক্রমণ ক্রমাগত বাড়ছে। ছাঁটাই, লক-আউট, বেকারি বাড়ছে। খাজনা, কর, জিনিসপত্রের দাম, পরিবহন-বিদ্যুৎ-শিক্ষা-স্বাস্থ্যের চার্জ বাড়ছে। এই অবস্থায় মানুষ আন্দোলন-বিক্ষোভ-প্রতিবাদে ফেটে পড়তে চাইছে। কোনও সংস্কার কর্মসূচির ভাঁওতা মানুষের এই বিক্ষোভ রোধ করতে পারবে না। কিন্তু শাসক শ্রেণি মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এই বিক্ষোভ রোধ করতে। তাদের সেই প্রচেষ্টারই অঙ্গ মুখ্যমন্ত্রীর এই মিছিল-মিটিং-আইন অমান্য বন্ধের সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাঁর মনে রাখা উচিত, নিষেধাজ্ঞা জারি করে, আইন করে, পুলিশি অত্যাচার চালিয়ে মানুষের বিক্ষোভকে বন্ধ করা যায় না। ইতিহাস বলছে, কোথাও কোনও শাসক কোনও দিন তা পারেনি। তা যদি হত তবে সিপিএমই এ রাজ্যে ক্ষমতায় থাকত। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যদি সে চেষ্টা করে করেন তবে রাজ্যের মানুষ আবারও তার যোগ্য জবাব দেবে।

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে হিন্দুত্ববাদীদের ভূমিকা উদঘাটিত

মালেগাঁও বিস্ফোরণে পাঁচ হিন্দুত্ববাদীর বিরুদ্ধে সরাসরি চার্জ গঠন করল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি। যদিও প্রথমে মহারাষ্ট্র অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড, সিবিআই এবং এন আই এ প্রত্যেকেই এই বিস্ফোরণে জড়িত থাকার অভিযোগে নয় মুসলিম যুবককে অভিযুক্ত করে। এরা সকলেই ২০০৬ সাল থেকে জেল খাটছিল।

মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও-এ ২০০৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর শব-এ-বরাতের দিন শুক্রবারের নামাজের পর দুপুর বেলা সাইকেলে রাখা এক বোমা বিস্ফোরণে ৩৫ জন মানুষের মৃত্যু হয়। আহত হয় ১২৪ জন। এই ঘটনায় মহারাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী স্কোয়াড ২০০৬ এর ২১ ডিসেম্বর ১৩ জন মুসলিমের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে। এদের মধ্যে নয় জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এটিএস-এর বক্তব্য ছিল, সন্ত্রাসবাদী সংগঠন সিমি সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই বিস্ফোরণ ঘটায়। চার্জসিট দাখিলের পর অভিযুক্ত যুবক আবরার আহমেদ সঈদ এই নয়জন যে বিস্ফোরণে যুক্ত তা স্বীকার করে স্বীকারোক্তি দেয়। কিন্তু পরে এই ব্যক্তিই জানায়, চাপের মুখে তিনি এই স্বীকারোক্তি দেন।

এর মধ্যে ২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর আবার গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রে বোমা বিস্ফোরণ হয়। এর মধ্যেও মালেগাঁও ছিল। এই বিস্ফোরণে ৮ জন মারা যায়। ৮০ জন আহত হয়। এই সন্ত্রাসবাদী হামলায় হিন্দুত্ববাদী জঙ্গি সংগঠনের যোগসাজশ প্রমাণিত হয়। সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর, শিব নারায়ণ, শ্যাম ভাওয়ারলাল সাহু গ্রেপ্তার হন। এদের হয়ে বিজেপি-র অন্যতম জোটসঙ্গী শিবসেনা জোর সওয়াল চালায় তার পত্রিকা 'সামনা'তে। এই ঘটনায় সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের লেফটেনান্ট কর্নেল শ্রীকান্ত পুরোহিত-এর যোগ আছে জানা যায়। ইনি হিন্দুত্ববাদী জঙ্গি সংগঠন 'অভিনব ভারত'-এর সদস্য। সেনাবাহিনীর মধ্যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রসার ঘটানো, অস্ত্র জোগাড় তাঁর কাজ ছিল। ২০০৯ এর লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশজুড়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রসারের উদ্দেশ্যে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয় বলে ধারণা।

ফলে ২০০৬ এর মালেগাঁও বিস্ফোরণ নিয়ে নতুন করে তদন্তের দাবি ওঠে বিভিন্ন মহলে। সিবিআই-কে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০১০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সিবিআই সেই একই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাপ্লিমেন্টারি চার্জসিট দাখিল করে। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে যায় ২০১০ এর ১৯ নভেম্বর নবকুমার সরকার ওরফে যতীন চ্যাটার্জী ওরফে স্বামী অসীমানন্দ ধরা পড়লে। হুগলি জেলার বাসিন্দা এই ব্যক্তি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ বা আর এস এস-এর সদস্য। সকলেই জানেন, এই আর এস এস-এর সংসদীয় রাজনীতির মুখ বিজেপি। দেখা যায়, ২০০৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি-র সমঝোতা এক্সপ্রেসে সন্ত্রাসবাদী হামলা, ২০০৭-এর ১৮ মে মক্কা মসজিদ, ২০০৭ সালের ১১ অক্টোবর আজমেঢ় শরিফ হামলা সহ নানা ধরনের হিন্দু সাম্প্রদায়িক জঙ্গি হামলার সঙ্গে তিনি যুক্ত। অসীমানন্দ গুজরাটের ডাং জেলায় সংঘ পরিবারের বিস্তৃত কাজের মাথা ছিলেন। গুজরাটের বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের নিয়ে হিন্দু মেলা সংগঠিত করা, হিন্দু মৌলবাদীদের আদর্শে আশ্রম, মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কাজ এখানে করতেন অসীমানন্দ। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে এই ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁর স্বীকারোক্তিতে জানা যায়, মালেগাঁও বিস্ফোরণ সহ দেশের নানা মসজিদে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি সহ দক্ষিণপন্থী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের আরও অনেক কর্মকর্তা। মুসলিম অধ্যুষিত বলে মালেগাঁওকে তারা বেছে নিয়েছিল শব-এ-বরাতের দিন।

এই স্বীকারোক্তির ফলে চতুর্দিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয় নানা সংগঠন। তার চাপে সিবিআই-কে বাতিল করে ২০১১ সালের ৬ এপ্রিল জাতীয় তদন্ত সংস্থা, অর্থাৎ এন আই এ-র হাতে কেসটিকে তুলে দিতে সরকার বাধ্য হয়। তাদের তদন্তে জানা যায়, মুসলিম সন্ত্রাসবাদী সংগঠন নয়, হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আর এস এস-এর কর্মীরা এর সঙ্গে যুক্ত। ওই বছরের নভেম্বর মাসে নয় জন জেলবন্দি মুসলিম যুবকের মধ্যে সাত জন জামিনে মুক্তি পান।

গত ডিসেম্বর মাসে এন আই এ মধ্যপ্রদেশের আর এস এস-এর সাথে যুক্ত রাজেন্দ্র চৌধুরী এবং ধন সিং কে গ্রেপ্তার করে। তদন্তে জানা যায়, এই দু'জন মালেগাঁও বিস্ফোরণ কাণ্ডে সাইকেলে বিস্ফোরক রেখেছিল। মনোহর নাওয়ারিয়া নামের আর এক ব্যক্তি সেই বিস্ফোরক তাদের হাতে তুলে দেয়। চতুর্থ অভিযুক্ত লোকেশ শর্মা 'সমঝোতা এক্সপ্রেস', 'মীনা মসজিদ', 'আজমেঢ় শরিফ' বিস্ফোরণের সাথেও যুক্ত। এরা সকলেই আর এস এস এবং তার নানা শাখা সংগঠনের সাথে যুক্ত। তাদের জঙ্গি কার্যকলাপের দায়িত্বে ছিল এরা।

কোথাও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঘটলে তদন্তের আগেই মুসলিম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরাই তাতে যুক্ত, তাদের নানা ধরনের জঙ্গি সংগঠন তার মাথা, এভাবে দেখানোটা এদেশে একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। মালেগাঁও-এর তদন্ত প্রক্রিয়ার শুরুতে তাই কোনও প্রমাণ ছাড়াই ওই সম্প্রদায়ের যুবকদের তড়িঘড়ি গ্রেপ্তার করে ফেলেছিল গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। এদের বিরুদ্ধে চার্জসিটও গঠন হয়ে গিয়েছিল। চাপ দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের মতো জঘন্য ঘটনাও প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। পরে নানা ঘটনাক্রমে জানা গেল, সন্ত্রাসবাদী হামলা ও হত্যার মূল অপরাধী হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সদস্যরা।

ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যে কেউ যে কোনও ধর্ম চর্চা করতে পারেন। আবার কোনও ধর্মের অনুসারী নন, এমন ব্যক্তিও এই সমাজে নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারেন। রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে ধর্মের কোনও স্থান থাকবে না। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের চরিত্র বলতে এটাই বোঝায়। কিন্তু বাস্তবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নিজেই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। পুঁজিবাদ যত ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছে, তত তার সমস্যা ঘনীভূত হচ্ছে। সমস্যা জর্জরিত মানুষ বাঁচার তাগিদে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়তে চাইছে। আর পুঁজিবাদ এই লড়াকু মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে ধর্মকে ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদের বেড়াজাল তৈরি করছে। ইতিহাসে ধর্মের উৎপত্তির সময় নিপীড়িত মানুষের চোখের জলের আশ্রয় হিসাবে তারও একটা ভূমিকা ছিল। কিন্তু ধর্ম ধীরে ধীরে শাসক শ্রেণির শাসনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ধর্মীয় গোঁড়ামি, মৌলবাদের জন্ম হয়েছে। এই মৌলবাদের শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সেবাদাস রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার অলিন্দে থাকার জন্য মানুষের মধ্যে থাকা ধর্মীয় ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত এই সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি চর্চা করে। তাকে ভোটের বাক্সে ফয়দা তোলার কাজে লাগায়। ধর্মকে ভিত্তি করে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করে। ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক হানাহানির জন্ম দিচ্ছে। হিন্দু, মুসলিম সহ সব ধর্মের মৌলবাদী শক্তিগুলি একই কাজ করছে কোনও না কোনও ভাবে। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন আর এস এস তার নানা রকমের জঙ্গি সংগঠনের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়ে হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ককেই সংহত করতে চেয়েছিল।

আবার, মুসলিম মানেই সন্ত্রাসবাদী, বিশ্বব্যাপী এই প্রচারের জনক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস সমৃদ্ধ মধ্য প্রাচ্য দখল এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য। এই দেশগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার করার জন্য মুসলিমদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিচ্ছে তারা। গোপনে এদের মধ্যেই নানা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী, দল তৈরি করছে। আবার সন্ত্রাসবাদী হামলার বিরুদ্ধে লড়তে হবে এই আওয়াজ তুলে তাদের সেই দেশগুলিকে আক্রমণ করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। বিশ্বব্যাপী মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সাথে ইসলাম ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসবাদীদের এক করে দেখানোর এই অপচেষ্টা চলছে। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই কোথাও সন্ত্রাসবাদী হামলা হলেই এরাই গ্রেপ্তার হয়।

অথচ, আমাদের দেশে বিজেপি-আর এস এস সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি করছে। এর অনুসারী হয়েই অন্যান্য ধর্মের মানুষের বিরুদ্ধে জঙ্গি হামলা চালাতেও দ্বিধা করছে না। এরা ফ্যাসিস্ট শক্তি। দেশের রাজনীতিতে এই বিপদ ক্রমশই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। মালেগাঁও, সমঝোতা এক্সপ্রেস, মক্কা মসজিদ, আজমেঢ় শরিফের সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ এই কথা প্রমাণ করছে।

কালনায় বিড়ি শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বিড়ি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৫১.১০ টাকা কিন্তু মালিকরা শ্রমিকদের দেয় মাত্র ৫০-৭৫ টাকা। ন্যূনতম মজুরি আইন অমান্য করা সত্ত্বেও এই মালিকদের বিরুদ্ধে সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয় না। কিন্তু ন্যায্য মজুরির দাবিতে শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে আইন অমান্য করলে সরকার নামিয়ে আনে শাস্তির খাঁড়া।

শ্রম আইন লঙ্ঘনের ঘটনা সিপিএম আমলেও যেমন ছিল, তৃণমূল শাসনেও তেমনি আছে। অথচ এদের কারও বিরুদ্ধেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। তাই ন্যূনতম মজুরি আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের যা পাওয়ার কথা তারা তা পাচ্ছে না। অবিলম্বে এই মজুরি প্রদান, লগবুক চালু, গ্র্যাচুইটি, বোনাস সহ ১৮ দফা দাবিতে ২১ মে বর্ধমান জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন কালনা মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শক এবং শ্রম কমিশনারকেও দাবিপত্র দেওয়া হয়।

কটকে কমসোমল শিবির

২৭- ২৮ মে ওড়িশার কটক জেলা কমসোমল শিবির অনুষ্ঠিত হয় বারাঙ্গায়। কিশোর-কিশোরীদের এই শিবির পরিচালনা করেন কমসোমলের রাজ্য ইনচার্জ এবং এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত। সততা, নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণাবলী অর্জন এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে বড় মানুষের জীবন সংগ্রাম থেকে শিক্ষণীয় দিকগুলি নিয়ে শিবিরে আলোচনা হয়। এ ছাড়া নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য, খেলা প্রভৃতিতে কিশোর-কিশোরীরা অংশগ্রহণ করে। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শিবিরের কাজ শেষ হয়।

আসামে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

২৪-২৬ মে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জেলাগুলির নেতা-কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয় ধুবড়ির লাইব্রেরি অডিটোরিয়ামে। এস ইউ সি আই (সি) পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য শিবিরে আলোচনা করেন। জ্ঞানতত্ত্ব, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং যথার্থ কমিউনিস্ট হওয়ার পথ কী, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি। পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সুইডেনেও জ্বলছে বিক্ষোভের আগুন

সুইডেনের রাজধানী স্টকহল্‌মের ৬০ কিমি উত্তরের এক মফস্বল শহর হাসবাই। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এখানে জ্বলে উঠেছিল বিক্ষোভের আগুন। ছড়িয়ে পড়েছিল আরও ১০টি শহরে। সুইডেনের অধিবাসী পর্তুগাল থেকে আসা ৬৯ বছর বয়সী এক অভিবাসী মানুষকে ১৯ মে পুলিশ নৃশংসভাবে গুলি করে মারে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সেখানকার বিক্ষুব্ধ অভিবাসী যুবকরা গাড়ি জ্বালিয়ে, স্কুল সহ বহু ঘরবাড়ি ধ্বংস করে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে তাদের ক্রোধ ক্ষোভ উগরে দিয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে।

অভিবাসীদের এই তীব্র ক্ষোভের কারণ কী? এক সময়ে, যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপে কর্মক্ষম মানুষের খুবই প্রয়োজন ছিল, সেই সময়ে ইউরোপের আরও অনেক দেশের মতো সুইডেনেও নানা দেশ থেকে দলে দলে মানুষ গিয়েছিল কাজের খোঁজে। দেশের আর্থিক বিকাশে তাদের অবদান কিছু কম নয়। আজ বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রুগ্ন দশা ছাপ ফেলেছে সুইডেনের অর্থনীতিতেও। এক সময় পুঁজিবাদীরা সুইডেনকে দেখিয়ে বলত, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেও কীভাবে জনকল্যাণ করা সম্ভব তা ঐ দেশ দেখাচ্ছে। আসলে জনগণের জন্য সুলভে শিক্ষা স্বাস্থ্য খাদ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রায় ভয় পেয়ে ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলি যে নানা জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিল, তাকেই এভাবে দেখানো হত। এখন সোভিয়েট সমাজতন্ত্র নেই, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও গভীর সঙ্কটে। অতএব, ঐ জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাগুলো কেড়ে নেওয়ার পালা চলেছে ইউরোপ জুড়ে। সুইডেনও ব্যতিক্রম নয়। চলছে ব্যাপক হারে বাজেট ছাঁটাই। এর কোপ গত দু-দশকেরও বেশি সময় ধরে সবচেয়ে বেশি করে এসে পড়ছে সেদেশের প্রান্তিক অভিবাসী গরিব-গুর্বো মানুষগুলির উপরেই। এরা এমনিতেই সর্বব্যাপক বেকারি, দারিদ্র ও শিক্ষাহীনতায় জর্জরিত। তার উপর রয়েছে পুলিশি জুলুম। যখন তখন নানা ধরনের চেকিংয়ের নামে তাদের হয়রানি করে পুলিশ। সামাজিক বৈষম্য ও অবমাননার শিকার এদেশের অভিবাসীরা। সব মিলিয়ে এদের বুকে দীর্ঘদিন ধরে জমে রয়েছে ক্ষোভের বারুদ। সেই ক্ষোভই ফেটে পড়েছে ১৯ মে অভিবাসী মানুষটিকে পুলিশের গুলি করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

যে হাসবাই শহরে ঘটনার সূত্রপাত, সেখানকার ৬০ শতাংশ মানুষই এসেছেন অন্য দেশ থেকে। এই শহরে বেকারত্বের হার জাতীয় গড়ের দ্বিগুণ। সরকারি অনুগ্রহে বিনা পয়সায় শিক্ষার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এদের অনেকেরই উচ্চশিক্ষা দূরে থাক, প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগও মেলেনি। এমনিতেই আর পাঁচটা পুঁজিবাদী দেশের মতো সুইডেনেও বেকার সমস্যা যথেষ্ট তীব্র। গত বছরের একটি হিসাবে এখানকার যুব অংশের মধ্যে বেকারত্বের হার ২৩.৬ শতাংশ। এর বাইরে রয়েছে অসংখ্য ছদ্ম বেকার। সাম্প্রতিক একটি সরকারি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, সুইডেনের বড় বড় শহরের পিছিয়ে থাকা এলাকাগুলিতে ১৬-২৯ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীদের এক-তৃতীয়াংই কোনও রকম কাজ বা পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত নেই। ব্যাপক বেকারত্বের পাশাপাশি কল-কারখানাগুলিতে কর্মী ছাঁটাইয়েরও বিরাম নেই। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছাঁটাইয়ের কোপ এসে পড়ে কাজে নতুন যোগ দেওয়া তরুণ শ্রমিক-কর্মচারীদের উপরে।

সুইডেনে আর্থিক বৈষম্যও ইদানীং যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে। 'অর্গানাইজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট'-এর সদস্য দেশগুলির মধ্যে আয় বন্টনে সমতার বিচারে ১৯৯৫ সালে প্রথম স্থানে

ছিল সুইডেন। এখন সে নেমে গেছে দশ নম্বর স্থানে। দেশের গড় মাথাপিছু আয়ের অর্ধেকেরও কম রোজগার করেন এমন মানুষের সংখ্যা ১৯৯৫-এর তুলনায় ২০১০-এ হয়ে গেছে দ্বিগুণেরও বেশি।

কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মডেল বলে খ্যাত সুইডেনও আজ সঙ্কটে কাঁপছে। সাধারণ মানুষ সমস্যায় সমস্যায় জর্জরিত, বিশেষ করে যুবশক্তি ফুঁসছে প্রবল ক্ষোভে। শুধু সুইডেনই নয়, গোটা ইউরোপ জুড়েই দেশে দেশে যখন তখন ফেটে পড়ছে যুব বিক্ষোভ। সুইডেনের ঘটনাতেও পুলিশ জানিয়েছে, যে সমস্ত বিক্ষোভকারী ধরা পড়েছে, তাদের বেশিরভাগেরই বয়স ২০ বছরের আশপাশে। একই ছবি স্পেন, ইটালি, পর্তুগাল ও গ্রিসের। ইউরোপের সবচেয়ে বড় আর্থিক শক্তি জার্মানির রাস্তায় ৩১ মে ও ১ জুন হাজার হাজার 'মানুষের বিক্ষোভের তাৎপর্য অনেক। ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সামনে সমবেত জনগণ আওয়াজ তুলেছে, ইউরোপের অন্যান্য দেশে জনজীবনের বাড়তি সঙ্কট সৃষ্টির জন্য দায়ী জার্মানির শাসকরা ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। এ অবস্থার বদল চাই।

সরকারি স্কুল বন্ধের ফতোয়া

শিকাগোয় পথে নেমেছেন শিক্ষক ও পড়ুয়ারা

দেশটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হলেও বিদ্বেষ-বঞ্চনার ছবিটা অন্যান্য দেশের মতোই। সেখানকার শিকাগো শহর সম্প্রতি সাক্ষী থাকল শিক্ষকদের এক বিশাল মিছিলের। সেখানকার ৫৪টি স্কুল বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পথে নেমেছিলেন শিক্ষকরা, গত ২০ মে। এই সরকারি স্কুলগুলির বেশিরভাগই রয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ ও ল্যাটিনো অধ্যুষিত শিকাগোর গরিব এলাকাগুলিতে।

ফতোয়া জারি করেছেন শিকাগোর মেয়র রাহম ইমানুয়েল যে, এই স্কুলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে। দক্ষিণপন্থী, জনগণের স্বার্থবিরোধী ও বর্ণবিদ্বেষী মানুষ হিসাবে এই মেয়রের কুখ্যাতি যথেষ্ট। তাঁর বক্তব্য, স্কুলগুলিতে ছাত্রের অভাব, তাই এগুলো উঠিয়ে দেওয়া উচিত। অথচ বাস্তব হল, এইসব স্কুলে ছাত্রছাত্রীর ভিড় যথেষ্ট এবং আর্থিক দিক দিয়েও এগুলির হাল ভালো নয়।

মেয়রের এই সিদ্ধান্তের পিছনে কাজ করছে দুটি বিষয়— গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য সরকারি খরচে ছাঁটাই এবং বর্ণবিদ্বেষী মানসিকতা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণাঙ্গ হলে কী হবে, সে দেশের কালো মানুষদের প্রতি আমলা-প্রশাসকদের বিদ্বেষমূলক মানসিকতা সুবিদিত। এই শিকাগোরই একসময়কার মেয়র চরম জাতিবিদ্বেষী রিচার্ড এম ডালের কথা মানুষ ভোলেনি। তাঁর দেখানো পথ ধরেই বর্তমান মেয়র শিক্ষায় শ্রেণিবিভেদ চালুর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দু'ধরনের স্কুল চালুর পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। এক ধরনের স্কুলে পড়বে খেটে-খাওয়া, কৃষ্ণাঙ্গ ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা। অন্য দিকে সম্পদশালী শ্বেতাঙ্গ ছেলেমেয়েদের জন্য থাকবে সর্ববিধ সুবিধাযুক্ত ঝাঁ-চকচকে সমৃদ্ধ কিছু স্কুল।

এসবের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছেন শিকাগোর শিক্ষকরা। তাঁদের সংগঠন 'শিকাগো টিচার্স ইউনিয়ন' পথে নেমেছে। ২০ মে তাঁরা ব্যাপক বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বন্ধ হতে চলা স্কুলগুলির সামনে। বিক্ষোভে যোগ দিয়েছেন ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও। এর আগে ২৭ মার্চ শিক্ষকরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। এ দিনের বিশাল মিছিলটি সিটি হলের সামনে আইন অমান্য করে এবং লাগোয়া ডালে প্লাজায় বিরাট বিক্ষোভ-সমাবেশ করে। শিক্ষকরা মেয়রের দপ্তরে ডেপুটেশন দেন। ২৬ জন আইন অমান্যকারী শিক্ষককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

যুদ্ধের অর্থনীতি

সম্প্রতি ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির একটি সিদ্ধান্ত হয়ত অনেকেরই চোখে পড়েছে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত সিরিয়ায় বাইরে থেকে অস্ত্র রপ্তানির উপর যে নিষেধাজ্ঞা তারাই জারি করেছিল, তা প্রত্যাহার করা হবে। অর্থাৎ এরপর ব্রিটেন জার্মানি ফ্রান্সের মতো রাষ্ট্রগুলি সিরিয়ায় অস্ত্র পাঠাতে পারবে। কাদের জন্য এই অস্ত্র পাঠাবে তারা? এই অস্ত্র কিনবে বর্তমানে যে 'বিদ্রোহীরা' সিরিয়ার শাসক প্রেসিডেন্ট আসাদ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে তারা। রক্তাক্ত সিরিয়ায় এই বিদ্রোহীরা কারা? এ কথা আর গোপন নেই যে, সিরিয়ায় এই তথাকথিত 'বিদ্রোহী' বাহিনীর মাথায় আছে কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আল কায়েদা। এ কথাও ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আমেরিকা সহ ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীরা আসাদ হঠাও-এর সশস্ত্র অভিযানে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে ঐ আল কায়েদাকেই প্রত্যক্ষ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং মার্কিন-ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মুখে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী হুঙ্কার যে কত বড় ছলনা, সেটাও পরিষ্কার। এই পরিপ্রেক্ষিতে সিরিয়ায় অস্ত্র বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে বিচার করলে বোঝাই যায় যে, প্রেসিডেন্ট আসাদ-এর সশস্ত্র বাহিনীর সাথে এঁটে ওঠার জন্যই সাম্রাজ্যবাদীরা আল কায়েদার হাতে আরও অস্ত্র তুলে দিতে চায়। ওদিকে আবার পুঁজিবাদী রাশিয়া আসাদ-এর পাশে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ইতিমধ্যেই সিরিয়াকে অত্যন্ত শক্তিশালী বিমান-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের সম্ভার বিক্রি করেছে। সব মিলিয়ে সিরিয়ার ভূখণ্ডে যুদ্ধের আগুন ভালোভাবে জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ বলা যায়।

কিন্তু কেন এই অস্ত্রের ঝনঝনানি? মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যই কি একমাত্র কারণ? ইউরোপের দেশগুলির অর্থনীতির চরম সংকটের দিকে তাকালে অপর গুরুতর কারণটিও বোঝা যায়। সদ্য প্রকাশিত ইউরোপের দেশগুলোর বেকারত্বের পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে যে, অর্থনীতির অবস্থা সঙ্গীন, ঘোর মন্দায় শিল্প ধুঁকছে, তার উপর সরকারি ঋণ কমাবার নামে ব্যয়সংকোচের ধাক্কায় ছাঁটাই চলছে ব্যাপক হারে। যে ১৭টি দেশ নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, তাদের বেকারত্বের হার এপ্রিল মাসের হিসাবে দাঁড়িয়েছে ১২.২ শতাংশ, যেটা গত বছরের এপ্রিলে ছিল ৭.৫ শতাংশ। গ্রিস ও স্পেনে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সের যুবসম্প্রদায়ের প্রায় অর্ধেকই বেকার। ইটালিতে বেকারির হার গত ৩৬ বছরের রেকর্ড ভেঙে ৪০ শতাংশ হয়েছে। এসবের অর্থ একটাই, তা হল শিল্পের বিকাশ দূরস্থান, চালু শিল্পই মুখ থুবড়ে পড়েছে। রাশিয়ার অবস্থাও ভিন্ন নয়।

এ অবস্থায় একটা দাওয়াই-ই পুঁজিবাদ জানে, তা হল, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন। যার বাজার রয়েছে গোটা বিশ্বে। না থাকলে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে বাজার তৈরি করতে সাম্রাজ্যবাদীরা সিদ্ধহস্ত। এখন সিরিয়া হয়ে উঠেছে সেই বাজার, যত আগুন জ্বলবে, যত মানুষ মারা যাবে — অস্ত্রের বাজার ততই টগবগে বা গরম হবে, ততই সাম্রাজ্যবাদীরা উল্লসিত হবে।

এ জন্যই এ যুগে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অর্থনীতিকে বলা হয় যুদ্ধ-অর্থনীতি, অর্থাৎ যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাকা ঘুরবে যুদ্ধের তালে তালে। এই পরিস্থিতিতেই রাষ্ট্রসংঘ একটি সম্মেলন ডাকতে যাচ্ছে — বিশ্ব থেকে যুদ্ধ দূর করার উপায় বের করতে। ঐ মঞ্চে অবশ্যই দেখা যাবে আমেরিকা-ইউরোপ ও রাশিয়ার শাসকদের যুদ্ধবিরোধী গালভরা বাণী বর্ষণ করতে!

সাংসদ তরুণ মণ্ডলের প্রতিবেদন

একের পাতার পর

করে নোডাল অফিসারের অফিসে (এক মাসের মধ্যে) জমা দেওয়ার পর ডি এম সাংসদ তহবিল থেকে রূপায়ণকারী এজেন্সির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠান। সাধারণত প্রকল্প বুঝে এককালীন বা দু'দফায় সেই অর্থ দেওয়া হয়। যেমন অ্যাম্বুলেন্স বা টিউবওয়েলের জন্য একবারেই সব টাকা পাঠানো হয়। অন্যান্য স্কিমের ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা, সরকারি অর্থে পরিচালিত সংস্থা বা স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থা (গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন) প্রথম কিস্তিতে ৭৫ শতাংশ এবং অন্যান্য সংস্থা প্রথম কিস্তিতে ৫০ বা ৬০ শতাংশ টাকা পায়। প্রথম কিস্তির টাকার কাজ করে ইউ সি জমা দিলে দ্বিতীয় কিস্তিতে বাকি টাকা পাঠানো হয়। প্রকল্পের কাজ শেষ করার পর এম পি-র নাম ও কাজের বিবরণ সহ ফলক বা বোর্ড লাগিয়ে ছবি সহ ইউ সি দিলে (সাধারণভাবে ৬ মাসের মধ্যে) এবং সেই কাজে টাকা উদ্বৃত্ত থাকলে সেটাও জমা দিলে তবে সেই কাজকে সরকারি খাতায় সম্পূর্ণ ধরা হয়। অন্যথায় রিপোর্টে সেই কাজ অসম্পূর্ণ দেখাবে। তাই দেখা যাবে, সাংসদ তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থে অ্যাম্বুলেন্স চলছে, ফেরিঘাট, স্কুলঘর বা বাসস্ট্যান্ড ব্যবহৃত হচ্ছে, রাস্তা দিয়ে মানুষ যাতায়াত করছে, টিউবওয়েলের জল পান করছে, অথচ রূপায়ণকারী এজেন্সি ইউ সি দেয়নি বলে কাজ 'অসম্পূর্ণ' দেখাচ্ছে।

একজন এম পি-র সাংসদ তহবিলে এখন প্রতি বছর ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ। কিন্তু রিপোর্টে দেখানো 'অসম্পূর্ণ কাজ'-এর টাকা ও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার যোগফল যদি আড়াই কোটি টাকার বেশি হয় তা হলে সেই এম পি-র পরের কিস্তির টাকা দিল্লি থেকে পাঠানো হয় না। কাজ ঠিক মতো হচ্ছে কি না তা সরেজমিনে দেখা, নিয়ম মাফিক কাজ না করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, ইউ সি আদায় করা, রূপায়ণকারী এজেন্সিদের নিয়ে মিটিং করা, মিটিংয়ে এম পি-কে বা তার প্রতিনিধিকে থাকতে আমন্ত্রণ জানানো, দিল্লিতে নিয়মিত কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট পাঠানো, অডিট করানো — সবই জেলা কর্তৃপক্ষের দেখভাল করার কথা। এসব করার জন্য এম পি ফান্ড থেকে ২ শতাংশ অর্থও বরাদ্দ থাকে। তারা এগুলো না করলে কোনও কিস্তির টাকা যদি দিল্লি থেকে না আসে, সেই ব্যর্থতার দায়িত্ব তো এম পি-দের ঘাড়ে চাপানো যায় না, আসলে বিগত ৩৪ বছরের 'মনসবদারী' শাসন ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ প্রশাসনের হাল কোন তলানিতে পৌঁছেছে, হাঁড়ির একটি ভাত টিপলে যেমন পুরো ভাত হয়েছে কি না বোঝা যায়, সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের কাজ দেখলেই তা বোঝা যায়। গত দু'বছরের শাসনে অবস্থার বিশেষ 'পরিবর্তন' হয়নি। এছাড়া আরও বহু কারণ আছে। সাংসদ তহবিলের কাজে এম পি-র নামে বোর্ড লাগানোর সরকারি নিয়ম আছে এবং তার জন্যও অর্থ বরাদ্দ থাকে। বিরুদ্ধ রাজনৈতির দলের এলাকায় কর্তৃত্ব থাকলে তারা বহু ক্ষেত্রে তা কাজে লাগাতে চায় না। কারণ তাতে মানুষ জেনে যায়, সেই প্রয়োজনীয় কাজটি সাংসদের সুপারিশে হয়েছে। কাজটি বিলম্বিত করতেও তারা চেষ্টা করে যাতে বিরুদ্ধ মতের এম পি-কে অকর্মণ্য বা অসমর্থ দেখানো যায়। আমার সংসদীয় ক্ষেত্রের বেশ কিছু এলাকায় এরকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং এগুলো যে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা জেলা প্রশাসন অস্বীকার করে না। আর আপনি যদি খুব ভালো গুণমানের কাজ চান তাহলে ইউ সি জমা পড়তে যে দেরি হবে এবং আপনার পরের বছরের টাকা আটকে থাকবে তা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। প্রসঙ্গত, লাগাতার প্রয়াস চালিয়ে গত ২৭ মে তারিখেই আমার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা নিশ্চিত হয়েছে।

সাংসদ তহবিলের কাজ নিয়ে সারা ভারতের রিপোর্টও এমন কিছু আহামরি নয়। এবং এর দ্বারা গতিশীল (!) ভারতের সামগ্রিক প্রশাসনের দুঃসহ চেহারাটা ফুটে ওঠে। এ বিষয়ে সংসদীয় কমিটিও তাদের রিপোর্টে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে যে, প্রশাসন তৎপরতা দেখাচ্ছে না এবং দুর্নীতিবাজদের যথোপযুক্ত শাস্তিও দিচ্ছে না। যদিও এম পি, এম এল এ-দের এই তহবিলের টাকা দিয়ে গ্রামবাংলা বা ভারতবর্ষের উন্নয়নের ইতরবিশেষ হয় না — কারণ দেশের বা রাজ্যের সামগ্রিক খরচের তুলনায় তা যৎসামান্যই। আমি যেহেতু আমার সংসদীয় ক্ষেত্রের প্রতিটি বিধানসভায় উন্নয়ন তহবিলের টাকা সমান করে ভাগ করে দিই এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা অনুযায়ী তা আবার মোটামুটি সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়ার চেষ্টা করি, তাতে দেখেছি প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এই পাঁচ বছরে মোট ১৮ থেকে ২৪ লক্ষ টাকা পেতে পারে। আজকের বাজারদর অনুযায়ী এই সামান্য টাকায় ১ কি মি পাকা রাস্তাও বানানো যায় না। গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং, কুলতলি, জয়নগর, মগরাহাট প্রভৃতি এলাকায় একটি পানীয় জলের নলকূপ বসাতেই ১ থেকে ২ লক্ষ টাকা লাগে। এ থেকেই বোঝা যায়, একজন এম পি সৎ এবং আন্তরিকভাবে চাইলেও তার সাংসদ তহবিল থেকে এলাকার উন্নয়ন কতটুকু করতে পারেন!

সাংসদ তহবিলের উন্নয়নের কাজের গতি আনার জন্য দিল্লির মন্ত্রকের নির্দেশ মতো প্রতি বছর অন্তত একবার রাজ্যের মুখ্যসচিবের উপস্থিতিতে রাজ্যের সব জেলাশাসক ও কমিশনারদের নিয়ে কাজের অগ্রগতির সমীক্ষা করা হয়, যেখানে এম পি-রাও উপস্থিত থাকেন। গত বছর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গেও তা হয়েছে। গত বছর ২২ জুন রোটান্ডার সভায় ঠিক হয় প্রতিটি জেলাশাসক/কমিশনার প্রতি মাসে এম পি/প্রতিনিধিদের নিয়ে কাজের অগ্রগতির রিভিউ মিটিং করবেন। আমার কাজের প্রস্তাবগুলি প্রতিটি পঞ্চায়েতে ছড়ানো বলে নিজেই উদ্যোগ নিয়ে জেলা প্রশাসনকে দিয়ে এই মিটিং সংগঠিত করেছি এবং নিজে সব রিভিউ মিটিংয়ে উপস্থিত থেকেছি। আমি জানি না, সব জেলায় নিয়মিত এই মিটিং হচ্ছে কি না। কিন্তু প্রশাসনের নানা স্তরে এই কাজগুলি বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে আশাপ্রদ উৎসাহ দেখি না। তা না হলে রাজ্যের ৩২ জন এম পি-র টাকা আসতে বিলম্ব হয় কেন? অবশ্য প্রশাসকের উপরও চাপ অনেক। যেমন কোনও নির্বাচন প্রক্রিয়া, গঙ্গাসাগর মেলা, সুন্দরবন উৎসব বা জেলায় তেমন কোনও ওজনদার মন্ত্রীর বিশেষ প্রশাসনিক সভা থাকলে সমগ্র প্রশাসনকে তখন সেগুলিকেই মুখ্য করে অন্য কাজগুলিকে গৌণ করে ফেলতে হয়। এত সব কিছু সত্ত্বেও যে আমি কিছু কাজ করতে পেরেছি — তা ভাবলে বিস্ময় জাগে!

তবে আমার নির্বাচন কেন্দ্রের মানুষরা জানেন, ২০১০ সালে যখন সরকার ও সংসদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংসদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়, তখন আমি দেশের, বিশেষত আমার নির্বাচন কেন্দ্রের সাধারণ মানুষের দূরবস্থার কথা বলে, তার প্রতিবাদ করি। পরে ঐ বর্ধিত বেতন নিতে বাধ্য হওয়ায় আমি ঘোষণা করি যে প্রতি মাসে বর্ধিত বেতনের ৬০ হাজার টাকা আমি জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তি প্রদানে ও নিয়মিত চিকিৎসা শিবিরে ব্যয় করব। আমি সেটা করে যাচ্ছি।

পঞ্চায়েত কি মানুষের হাতে ক্ষমতা দিয়েছে?

একের পাতার পর

যার খড়ের চালও ছিল না, সে দু বছর পঞ্চায়েতী করলেই দুতলা বাড়ির মালিক হয়ে যায়।

সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি এবং দুর্নীতি গ্রামীণ জনসাধারণের হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। পঞ্চায়েতগুলি দুর্নীতিবাজদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সামান্য কিছু টাকা লোন, ইট বিছানো একটা রাস্তা, একটা টিউবওয়েল, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, অন্নপূর্ণা যোজনা, ইন্দিরা আবাস যোজনা বা বিপিএল কার্ডও দরিদ্র মানুষের অধিকার হিসাবে বিবেচিত হয় না। এগুলি পঞ্চায়েতের কর্তাদের দয়া-দাক্ষিণ্যের বিষয়বস্তু। ১৯৭৮ সালে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালেই সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে আমাদের দল এস ইউ সি আই (সি)-এর পক্ষ থেকে দেখানো হয়েছিল যে, এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সম্প্রসারিত রূপই হল পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। ১৯৭৮ সালের ২৩ মে গণদাবী লিখেছিল — 'এই পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা বজায় রেখে ক্ষমতার যতই বিকেন্দ্রীকরণ করা হোক, তার দ্বারা জনসাধারণের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা আসে না বা আসতে পারে না। আসল ক্ষমতাটা সেই মালিক জোতদার শ্রেণির হাতেই থেকে যায়। কারণ পুঁজি, আইনকানুন, পুলিশ সবকিছুই তাদের হাতে। সকল মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাই জানে এ কথা। ... রাজ্যের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা আইনসভারই যেখানে এ বিষয়ে কোনও ক্ষমতা নেই, সেখানে পঞ্চায়েতের মারফত এ কাজ করার প্রশ্ন উঠতেই পারে না।'

সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই বক্তব্য মেলালেই মনে হবে, হুবহু বর্তমান সময়ের প্রতিচ্ছবি। পঞ্চায়েতের হাতে নীতি নির্ধারণের কোনও ক্ষমতাই নেই। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের আইন অনুসারে ডিএম, এসডিও, বিডিও-দের মতো আমলাদের নির্দেশ পালন করাই পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের কাজ। আমলাতন্ত্রেরই একটা অংশ হিসাবে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, জনগণের উপর ছড়ি ঘোরানোর প্রবণতা পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রকট।

যে রাজনৈতিক দলগুলি পঞ্চায়েত পরিচালনা করছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি জনবিরোধী, না জনস্বার্থবাহী এটিও বিচার্য বিষয়। বাস্তবে কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল প্রভৃতি দলগুলি লোকসভা, বিধানসভা যেখানেই ক্ষমতায় আছে, সেখানেই জনবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলছে। পঞ্চায়েতের ক্ষমতা নিয়ে তারা অন্য কিছু করবে এ কথা ভাবা বাতুলতা মাত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই গ্রামীণ জনগণকে এরা ব্যবহার করতে চায় ভোটব্যাঙ্ক তৈরির আমানত হিসাবে। কিছু পাইয়ে দিয়ে তাদের তাঁবে জনগণকে ধরে রাখাই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য। স্বভাবতই জনগণের প্রকৃত ভালোমন্দের সঙ্গে বেশিরভাগ পঞ্চায়েত প্রতিনিধির কোনও সম্পর্ক নেই। অধিকার আদায়ের জন্য গ্রামীণ জনসাধারণ যাতে আন্দোলনে সামিল না হয়, ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাবি জানাতে না পারে তার জন্যই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি আমদানি করা হয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সবচেয়ে প্রাথমিক স্তরের রক্ষক হিসাবেই কাজ করছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষক হিসাবে আজকের দিনে যারাই কাজ করুক না কেন তাদের চরিত্রে এই ব্যবস্থা থেকে জন্ম নেওয়া পচা-গলা সংস্কৃতির ছাপ পড়তে বাধ্য। পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রেও যে মানুষগুলি এই ব্যবস্থার রক্ষক তাদের মধ্যে সীমাহীন দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের ঝোঁক প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই পঞ্চায়েতকেও কিছুটা অর্থে জনমুখী করার চেষ্টা করা যেতে পারত যদি গ্রামীণ জনসাধারণকে নিয়ে গণকমিটির ভিত্তিতে পঞ্চায়েত পরিচালনা করা যেত। এস ইউ সি আই (সি)-এর এই দাবি সিপিএম কোনওদিন মানতে চায়নি। ২০০৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে এস ইউ সি আই (সি)-এর যুক্ত গণআন্দোলনের মধ্যেই যখন পঞ্চায়েত নির্বাচন এসে পড়ে সেই সময়েও তৃণমূলের কাছে গণকমিটির ভিত্তিতে পঞ্চায়েত পরিচালনার কথা এস ইউ সি আই (সি)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়। তখন তাঁরা বলেছিলেন নির্বাচনটা হয়ে যেতে দিন পরবর্তীকালে গণকমিটি করার কথা আমরা ভাবব। দেখা গেল তাঁরাও পঞ্চায়েতকে অন্যান্য দলের মতোই স্বজন-পোষণ, অবাধ লুঠ এবং কিছু পাইয়ে দেওয়ার মাধ্যমে গ্রামীণ ভোট ব্যাঙ্ক তৈরির সংকীর্ণ স্বার্থেই কাজ করছেন।

সাধারণ মানুষের স্বার্থে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে যদি ন্যূনতম কাজে লাগাতে হয় তা হলে গণকমিটির ভিত্তিতে গ্রামীণ মানুষের সমস্যাগুলিকে নিয়ে নিরন্তর আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া কোনও পথ নেই। এ জন্য পঞ্চায়েত নির্বাচনকেও দেখতে হবে গণআন্দোলনের একটি অন্যতম রূপ হিসাবে। গ্রামীণ জনসাধারণকে কিছু পাইয়ে দেওয়ার জন্য নয়, বরং তাদের মধ্যে আন্দোলনমুখী মানসিকতা তৈরি করে তার ভিত্তিতে অধিকার আদায় করার মন তৈরি করতে পারলেই একমাত্র পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যদের দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং পঞ্চায়েতকে ভিত্তি করে কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ সম্ভব। যে সমস্ত পঞ্চায়েতে এমনকী এস ইউ সি আই (সি) সদ্যরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবেন, সেখানেও গণআন্দোলনের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের অধিকার আদায় এবং গণকমিটির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েত পরিচালিত না হলে ঐ পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদেরও অধঃপতন ঘটতে বাধ্য। এই বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গিতে গণআন্দোলনের পরিপূরক একটি কর্মসূচি হিসাবেই আমাদের দল পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপির মতো কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূদের পরাজিত করে এস ইউ সি আই (সি) এবং গণআন্দোলনের মধ্য থেকে উঠে আসা গণকমিটির যে সমস্ত প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তাদের পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জয়ী করবেন আমরা সেই আশা রাখি।

বেলেঘাটায় নারীনিগ্রহ বিরোধী কনভেনশন

কলকাতার বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুলে (মেন) ৩০ মে বেলেঘাটা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু বিশিষ্ট নাগরিক ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে নারীনিগ্রহ বিরোধী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নারীনিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির পক্ষে মহম্মদ শাহনওয়াজ। তিনি নারী নির্যাতন ও সামাজিক অবক্ষয়ের কারণগুলি ব্যাখ্যা করেন এবং এর বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। আলোচনা করেন রেখা গোস্বামী, তপন কুমার সিনহা প্রমুখ। বরুণ কুমার রায়কে সভাপতি এবং শুক্লা ঘোষ, ডাঃ মিতা দত্ত ও দীপু কুণ্ডুকে সম্পাদক করে 'নারীর সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা-সুরক্ষা কমিটি, বেলেঘাটা' গঠিত হয়।

ভ্রম সংশোধন ঃ ১৮ মে প্রয়াত কমরেড প্রতিভা মুখার্জীর মরদেহে বলশেভিক পার্টির পক্ষ থেকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কমরেড সমর বর্ধন। ভুল করে অন্য নাম ছাপা হওয়ায় আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

এতই যদি গ্রামীণ উন্নয়ন, তা হলে দলে দলে মানুষ গ্রাম ছাড়ছে কেন

ঘোষিত হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তাকে সামনে রেখে সিপিএম নেতারা ভাঙা রেকর্ড বাজাচ্ছেন যে তাদের ৩৪ বছরের শাসনে গ্রামবাংলার অভাবনীয় উন্নয়ন হয়েছে। তৃণমূল বলছে, তাদের ২ বছরের শাসনে ৯৫ শতাংশ কাজই হয়ে গিয়েছে। যদি সত্যি সত্যিই গ্রাম বাংলার এত উন্নয়ন হয়ে থাকে তা হলে গ্রাম ছেড়ে হাজার-হাজার নারী-পুরুষ কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে যেতে বাধ্য হচ্ছে কেন?

ধানের গোলা হিসেবে খ্যাত বর্ধমান, নদীবহুল দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবা, উর্বর চাষভূমি নদীয়ার কৃষ্ণনগর কিংবা মুর্শিদাবাদ সহ পশ্চিমবঙ্গের এমন কোনও জায়গা বাদ নেই যেখান থেকে মানুষ কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেননি। ১২ থেকে ৩৫-৪০ সব বয়সীই আছে এঁদের মধ্যে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এঁদের বাইরে যাওয়ার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক সংকট। রাজমিস্ত্রি, মুটে-মজুর থেকে শুরু করে রিক্সাওয়ালা, পরিচারিকা এমনকী বহু শিক্ষিত যুবকও কাজের খোঁজে বাইরে চলে যাচ্ছেন। শহর কলকাতার বহু মানুষও পাড়ি দিচ্ছেন অন্যত্র। তবে যে ঢাকঢোল পিটিয়ে ১০০ দিনের কাজের প্রচার চলছে রাজ্য সরকারের তরফে, গ্রামীণ অধিকাংশ পরিবারই ১০০ দিনের কাজের আওতায় চলে এসেছে বলে বলা হচ্ছে, গ্রামীণ মানুষের হাসি হাসি ছবি তুলে ধরে প্রচার করা হচ্ছে তারা কাজ পেয়ে কত আরামে কত সুখে দিন কাটাচ্ছে, এসব কি নিছকই প্রচার?

সরকার ৩৬৫ দিনের মধ্যে মাত্র ১০০ দিন কাজ দেওয়ার ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে গ্রামীণ মানুষদের একটা ক্ষুদ্র অংশকে কোনও বছর ২৫ দিন, কোনও বছর ২৮ দিন কাজ দিতে পেরেছে। একটা বড় অংশই কাজ থেকে বঞ্চিত। মজুরিও কম। তীব্র মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এঁদের সংসার চলে কীভাবে? সরকারের আরও যে সব প্রকল্পের গল্প শোনানো হয়, সেগুলিতেও যদি কাজের সুযোগ থাকত, তাহলে কি এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হত? শখ করে কেউ চেনা জায়গা, পরিচিতদের ছেড়ে অচেনা অজানা জায়গায় ছুটে যেত কি? বহু ব্যথা, বেদনা এবং গ্লানির শিকার হয়ে মানুষগুলি অন্যত্র চলে যায়, যেখানে ভাষা আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, সমস্ত কিছুই অপরিচিত। সরকার কি এঁদের খবর রাখে না? অবশ্যই রাখে। ভোটের সময় ভোটার তালিকায় এঁদের দলীয় ভোটার হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এলাকায় ফিরিয়ে এনে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কী সিপিএম, কী তৃণমূল, কী কংগ্রেস সকলেই। কিন্তু কাজ জোগানোর প্রশ্নে এরা নীরব।

হাওড়া স্টেশন বা মালদা স্টেশনে দাঁড়ালে মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদীয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণার এরকম অসংখ্য শ্রমিক, যারা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে পরিচিত, তাদের জীবনযন্ত্রণার টুকরো টুকরো ছবি ভেসে ওঠে। দেখা যায় গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ, প্রবল শীত বা বর্ষণকে উপেক্ষা করে নিউ দিল্লিগামী ফরাক্কা প্যাসেঞ্জার বা করমণ্ডল এক্সপ্রেসে লটবহর নিয়ে এদের চেপে বসতে কিংবা বলা ভালো প্রচণ্ড ভিড় ট্রেনে কামরার মধ্যে কোনওরকমে নিজেদের গুঁজে দিতে। এরা আমেদাবাদ, পুনে, ব্যাঙ্গালোর, নয়ডা, গাজিয়াবাদ, গুঁরগাও ও অন্যান্য শহরের উদ্দেশে সওয়ার হয়। কোথাও নির্মাণ শ্রমিক, কোথাও কাগজকুড়ানি, কোথাও রিক্সাওয়ালা তো কোথাও হোটেল বয় বা পরিচারিকার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন এঁরা। কারণ কী? বহুজনই তাদের অর্থ উপার্জনের একমাত্র উপায় জমি হারিয়ে অথবা নদীতে মাছ ধরার অধিকার হারিয়ে বাধ্য হয়ে গ্রাম ছাড়ছেন। এর উপর কাজ পাওয়ার প্রচণ্ড অনিশ্চয়তা, উপার্জন কমে যাওয়া তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের প্রতিবন্ধক হচ্ছে। প্রচণ্ড মূল্যবৃদ্ধির বাজারে সংসারে একজনের নামমাত্র রোজগারে নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর অবস্থা। এর উপর সরকারি ও বেসরকারি নিয়োগ বছর-বছর কমে যাওয়া, সংগঠিত-অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োগ হ্রাস— এ সমস্তই একটা বড় অংশের মানুষকে পরিযায়ী শ্রমিক করে তুলছে। আবার সাইক্লোন, আয়লা বা নদী ভাঙনের ফলে সর্বস্ব হারানো বহু মানুষকে কাজের খোঁজে বাইরে চলে যেতে হচ্ছে। সুন্দরবনের বাসন্তী, ক্যানিং-১, ক্যানিং-২ ও গোসাবা ব্লকে, মুর্শিদাবাদ, মালদা প্রভৃতি জেলায় কর্মক্ষম মানুষ আছেন এমন কোনও পরিবার প্রায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। মেয়েরা পর্যন্ত ঘর ছেড়ে অন্যত্র কাজের সন্ধানে যাচ্ছে। বাড়িতে শুধু অক্ষম বয়স্ক মানুষ ও শিশুরা পড়ে আছে। পরিবারগুলি ভেঙে যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষেত্রে ২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত মানুষের সংখ্যা ছিল ৪২৪.৯ হাজার, ২০১০ সালে তা নেমে এসেছে ২৭০.৫ হাজারে। এই সময়ে রাজ্য সরকারি ক্ষেত্রে কর্মচারীর সংখ্যা নেমে এসেছে ৪৪১.২ হাজার থেকে ৩৪৭.৯ হাজারে, আধা-সরকারি ক্ষেত্রে কর্মীসংখ্যা ৬২৩.৫ হাজার থেকে কমে হয়েছে ৪৪৪.৭ হাজারে, স্থানীয় সংস্থায় (লোকাল বডিজ) ১৭৩.৫ হাজার থেকে কমে হয়েছে ১২৩.৩ হাজার। বিশ্বায়ন উদারীকরণ বেসরকারিকরণ প্রভৃতি যে সংস্কার নামিয়ে আনে তারই বলি হয়ে কর্মীসংখ্যা কমেছে।

যারা আগে দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানায় পাড়ি দিত, এখন তাদের অনেকেই বেঁচে থাকার তাগিদে সুদূর বিদেশে, আরব দেশগুলিতেও এরা ছড়িয়ে পড়েছেন। কারণ, পেছন ফিরলেই অনাহার, মৃত্যুর হাতছানি অপেক্ষা করে আছে। যদি কিছু অর্থ রোজগার করে পরিবার চালানো যায়, সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, তাদের মুখে হাসি ফোটানো যায়, এই চিন্তায় প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যেও এরা দিন গুজরান করেন।

এত মানুষ যে অন্য রাজ্যে যাচ্ছেন, সেখানে কি তবে প্রচুর কাজ? বাস্তব বলছে, অন্য রাজ্যেও কাজের সংকট। সেখানকার মানুষও আর কোনও রাজ্যে গিয়ে দিন গুজরান করতে বাধ্য হচ্ছেন। বিহারের শ্রমিক আসছে পশ্চিমবঙ্গে, এখানকার শ্রমিক যাচ্ছে বিহারে। পুঁজিবাদী এই সমাজের আভ্যন্তরীণ সংকটে কাজের বাজারে সর্বত্রই মন্দা। কিন্তু কলকারখানা বা কোম্পানি মালিকরা ভিনরাজ্যের বাসিন্দা পেলে লুফে নেয়। কারণ, এদের দিয়ে মালিকের মর্জিমাফিক কাজ করানো যায়। সহজেই বেশি সময় খাটিয়ে নেওয়া যায়। তুলনামূলকভাবে বেশি বেতনের আশায় তারা খাটেও। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই তাদের মাইনের পুরো টাকা দেওয়া হয় না। তারা অসংগঠিত ও ছিন্নমূল হওয়ায় বিক্ষুব্ধ হলেও সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলা সহজ হয় না। আবার এই মজুরদের কাজে নিয়ে যায় যে দালালরা, তাদের সাথে মালিকের এমনই বোঝাপড়া থাকে যে, শ্রমিকের প্রাপ্য টাকার অনেকটাই আত্মসাৎ করে বাকিটা শ্রমিকদের দেয়। কোথাও এমনকী শ্রমিকদের পরিচয়পত্র বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র আটকে রেখে তাদের অনুগত থাকতে বাধ্য করে। বিদেশে কর্মরতদের সে দেশে থাকার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে দালালরা তাদের আর কোনও দায়িত্ব নেয় না। তখন সহায় সম্বলহীন অবস্থায় লুকিয়ে বেড়ানো ছাড়া তাদের আর কোনও উপায় থাকে না। এমনও ঘটেছে যে, শ্রমিকদের বেআইনিভাবে বিদেশে পাঠানোর জন্য দালালরা মালবাহী জাহাজের আলো-বাতাসহীন কুঠরির মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় দমবন্ধ হয়ে তাদের মৃত্যু ঘটেছে।

সমাজে এই অমানুষিক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী কে? দায়ী আজকের পুঁজিবাদী সমাজ। পুঁজিবাদে উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা ব্যক্তি মালিকের হাতে থাকে। সমাজে মানুষের প্রয়োজন থাকলেও যদি তাতে মুনাফা না হয় তবে মালিকরা উৎপাদন করে না। দেশজুড়ে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পাওয়ায় শিল্পোৎপাদনও মার খাচ্ছে। ফলে বাড়ছে লে-অফ, লকআউট, ছাঁটাই। বেকারি হু হু করে বাড়ছে। নিরুপায় মানুষ কাজের সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। এক দেশ থেকে আর এক দেশে।

গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্র, রাজ্য, আধা-সরকারি ও স্থানীয় সংস্থায় কর্মসংস্থান কীভাবে কমেছে তার একটি তালিকা প্রকাশ করেছে ডাইরেকটরেট অফ এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো অব অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্স অ্যান্ড স্কুল এডুকেশন ডাইরেকটরেট। তাতে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষেত্রে ২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত মানুষের সংখ্যা ছিল ৪২৪.৯ হাজার, ২০১০ সালে তা নেমে এসেছে ২৭০.৫ হাজারে। এই সময়ে রাজ্য সরকারি ক্ষেত্রে কর্মচারীর সংখ্যা নেমে এসেছে ৪৪১.২ হাজার থেকে ৩৪৭.৯ হাজারে, আধা-সরকারি ক্ষেত্রে কর্মীসংখ্যা ৬২৩.৫ হাজার থেকে কমে হয়েছে ৪৪৪.৭ হাজারে, স্থানীয় সংস্থায় (লোকাল বডিজ) ১৭৩.৫ হাজার থেকে কমে হয়েছে ১২৩.৩ হাজার। বিশ্বায়ন উদারীকরণ বেসরকারিকরণ প্রভৃতি যে সংস্কার নামিয়ে আনে তারই বলি হয়ে কর্মীসংখ্যা কমেছে। কংগ্রেস-সিপিএম সহ সংশ্লিষ্ট সকলেই এই ছাঁটাই নীতি অনুসরণ করেছে। একই পথেই হাঁটছে তৃণমূল সরকার। ফলে নতুন কর্মক্ষেত্র তো সৃষ্টি হচ্ছেই না, উপরন্তু চালু ক্ষেত্রগুলিও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে গ্রাম-শহর থেকে বেকার যুবক, ছাঁটাই শ্রমিক সকলেই কাজের জন্য পাড়ি দিচ্ছে ভিনরাজ্যে এমনকী বিদেশেও। এই তথ্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় গ্রামবাংলার বিপুল উন্নয়নের যে প্রচার চলে, তা কত অন্তঃসারশূন্য।

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন বা অন্য কোনও নির্বাচনের দ্বারা এই পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব নয়, এ কথা বুঝতে হবে রুটি-রুজির প্রয়োজনে গ্রাম বা শহর থেকে উৎখাত হওয়া মানুষগুলিকে। যে কারণে এই সংকট সেই পুঁজিবাদকে হঠাতে না পারলে এর থেকে নিস্তার নেই।

শিল্প মালিকের কাছে বিকিয়ে যাচ্ছে চাষের জল, বিপন্ন মহারাষ্ট্রের চাষিরা

কৃষিপ্রধান রাজ্য মহারাষ্ট্রে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জল মিলছে না, কোটি কোটি গ্যালন জল বিকিয়ে যাচ্ছে শিল্প তালুক এবং এস ই জেড-এর গহ্বরে। সম্প্রতি বেসরকারি একটি সংস্থার রিপোর্টে প্রকাশ, রায়গড়ের হেটোভেন বাঁধের জলের ৮৮ শতাংশই এস ই জেড এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়। সরকারের হাই পাওয়ার কমিটি (এইচ পি সি) ও শিল্পমালিকদের বোঝাপড়ায় অধিকাংশ জলই চাষের কাজে ব্যবহৃত না হয়ে ব্যক্তি মালিকদের স্বার্থে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের সংরক্ষিত জলের সুষম বণ্টন না হয়ে শুধুমাত্র পুঁজিমালিকদের গহ্বরে ঢালা হচ্ছে। প্রকৃতির দান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে জল সংরক্ষণ তা বেসরকারি মালিকদের স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে চাষিদের স্বার্থকে বিপন্ন করে। ২০০৩ সালের সরকারের জলনীতিতে বলা হয়েছিল, সংরক্ষিত জলের ২৫ শতাংশই শুধুমাত্র চাষ ছাড়া অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু সম্প্রতি তথ্য জানার অধিকার আইনে জানা গেছে, ২৩টি প্রকল্পের ৩০–৯০ শতাংশ জল চাষ বাদ দিয়ে ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। পাবনা ও আম্বা বাঁধের ৮১ শতাংশ জল অন্যান্য কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। থানের সূর্য বাঁধের জল, যা উপজাতি মানুষদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যবহৃত হওয়ার কথা, তার ৫৩ শতাংশ শিল্প ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়। নাসিকের দর্না গঙ্গাপুর কমপ্লেক্স বাঁধের জলের ৭৪ শতাংশ চাষের পরিবর্তে অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়। সংরক্ষিত জল মূলত শিল্প তালুক ও সংলগ্ন শহরগুলির অধিবাসীদের পানীয় জল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যার মধ্যে আবার বেশিরভাগটাই চলে যাচ্ছে শিল্পে। সংরক্ষিত জলের বেশিরভাগটাই যখন পশ্চিম মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে এস ই জেড ও তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য খরচ হচ্ছে, তখন জলের অভাবে চাষ করতে না পেরে ঐ পশ্চিম মহারাষ্ট্রের বিদর্ভেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে তুলো চাষিরা। আখ চাষি ও আঙুর চাষিদের অবস্থাও দুঃসহ। গরিব চাষিদের প্রতি সরকারের নজর নেই।

মহারাষ্ট্রের শিবসেনা-এনসিপি সরকার ক্ষমতায় এসেছিল সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে চাষিদের সংকটমোচনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। কিন্তু আজ ১ শতাংশ পুঁজিমালিকদের স্বার্থে তারা ৯৯ শতাংশ গরিব মানুষের স্বার্থ বলি দিচ্ছে। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জল লাগবে, এ কথা ঠিক। কিন্তু চাষিদের চাষের জল বিকিয়ে দিতে হবে মুনাফাখোরদের কাছে, এই অধিকার তাদের দিল কে? এ প্রশ্ন উঠছে মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে।

সরকার ভালো করেই জানে, চাষিদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে ভোটব্যাঙ্কে ধস নামবে। তা হলে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারার সরকারের এই সিদ্ধান্ত কেন? কারণ, শিল্পায়নের জিগির তোলা সরকারগুলি পুঁজিপতিদের আর্শীবাদ ছাড়া এক পা-ও চলতে পারে না, আর পুঁজিমালিকদের আর্শীবাদ পেতে গেলে সর্বাগ্রে তাদের তুষ্ট করা প্রয়োজন। তাই চাষের জল না পেয়ে, চাষ করতে না পেরে চাষি মারা গেল কি বেঁচে থাকল, তাতে তাদের কিছুই আসে যায় না, পুঁজিমালিকদের মুনাফার গহ্বরে জল ঢালতে পারলেই হল। চাষিদের মধ্যে এ প্রশ্ন উঠেছে যে এই সরকার কি তাহলে ১ শতাংশ পুঁজিমালিকদের?

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

ক্যানিংয়ের জীবনতলায় ডাঃ তরুণ মণ্ডলের উদ্যোগে চিকিৎসা শিবির

জীবনতলার চিকিৎসা শিবিরে ডাঃ তরুণ মণ্ডল ও অন্য চিকিৎসকরা

'মেডিকেল কলেজ এক্স-স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা'-র পক্ষ থেকে ২৬ মে ক্যানিং-২ ব্লকের জীবনতলায় বিনামূল্যে একটি চিকিৎসা শিবির করা হয়। এই ব্লকটি অত্যন্ত পশ্চাদপদ। উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা তো দূরের কথা, কাছাকাছি সরকারি বা বেসরকারি সাধারণ স্বাস্থ্য পরিষেবাটুকুও নেই। এলাকাটি জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হওয়ায় এই কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল এই ব্লকের মঠেরদিঘিতে এর আগে একটি স্বাস্থ্যমেলা করেছিলেন। তিনি নিজেও এই এলাকায় যখনই যান, কিছুটা সময় তিনি সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

এই পিছিয়ে পড়া এলাকায় একটি চিকিৎসা শিবির করার জন্য এ বছর তিনি 'মেডিকেল কলেজ এক্স-স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা'-কে অনুরোধ করেন। তিনি নিজেও মেডিকেল কলেজের এক্স-স্টুডেন্ট। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে এক্স-স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন জীবনতলার হাওড়ামারি হাই স্কুলে এই চিকিৎসা শিবিরটি সংগঠিত করে। 'জীবনতলা নবজাগরণ' সংস্থার সদস্যরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে চিকিৎসা শিবিরটি পরিচালনায় সাহায্য করেন। ক্যানিং ২নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতিও আগত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আতিথেয়তা সহ নানাভাবে এই চিকিৎসা শিবিরকে সফল করতে এগিয়ে আসে। হাওড়ামারি হাই স্কুল পরিচালন কমিটি চিকিৎসা শিবিরের জন্য তাঁদের স্কুলটি ব্যবহারের অনুমতি দেন। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের চিকিৎসক ও মেডিকেল ছাত্ররা এই শিবিরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ডাঃ তরুণ মণ্ডল তাঁর বর্ধিত বেতন থেকে প্রতি মাসে যে অর্থ দিয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির করেন, এ মাসের সেই অর্থ তিনি এই শিবিরে ওষুধ বিতরণের জন্য ব্যয় করেন।

চিকিৎসা শিবিরের শুরুতে 'নবজাগরণ'-এর সদস্যরা প্রত্যেককে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। আগত বিশিষ্ট চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সওকত মোল্লা। স্বাস্থ্যশিবিরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মেডিকেল কলেজ এক্স-স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ নির্মল পোল্লে, সম্পাদক ডাঃ প্রশান্ত ভট্টাচার্য এবং মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষে ডাঃ সজল বিশ্বাস। সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল তাঁর বক্তব্যে প্রত্যেককে অভিনন্দন জানান এবং আগামী দিনেও তাঁর সাধ্য অনুযায়ী নিজে এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায় এরকম চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলে জানান।

চিকিৎসা শিবিরে ৫৮২ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। অর্থোপেডিক, হৃদরোগ, স্ত্রীরোগ, শিশু বিভাগ, নাক-কান-গলা, চর্মরোগ, চক্ষু বিশেষজ্ঞ সহ সাধারণ চিকিৎসকদের কাছ থেকে এই চিকিৎসা ও ওষুধ পেয়ে রোগী সহ এলাকার সকলেই এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিলকে কেন্দ্র করে জেলায় জেলায় এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা আক্রান্ত

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী স্থির করা থেকে মনোনয়নপত্র দাখিল করার সমস্ত স্তরে বিভিন্ন জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস বাহিনীর বাধা ও হামলার মুখে পড়তে হচ্ছে এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের। বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামে বি ডি ও অফিসে ৩০ মে মনোনয়নপত্র তুলতে যাওয়ার পথে এস ই উ সি আই (সি) কর্মী কমরেড ডালিম ঘোষ ও কচি মুন্সিকে বাধা দেওয়া হয়। তাদের এড়িয়ে বিডিও অফিসে ঢুকে মনোনয়নপত্র নিয়ে বেরোবার সময় বেশ কিছু তৃণমূলের লোক তাদের ঘিরে ধরে হেনস্থা করে, মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় ও মনোনয়নপত্র ছিঁড়ে ফেলে দেয়। থানায় লিখিত অভিযোগ করে তার কপি নির্বাচন কমিশনকে পাঠানো হয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর থানার ব্রজলালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে চকমোজাইক গ্রামে ৩০ মে রাতে কর্মী সভা সেরে ফেরার পথে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন এস ইউ সি আই (সি) পটাশপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড নারায়ণ বেরা ও সদস্য কমরেড শঙ্কর দাস। পটাশপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কমরেড শঙ্কর দাসকে পরীক্ষা করে কানে আঘাত পাওয়ার জন্য ই এন টি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দেখাবার সুপারিশ করেছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনীতে ছিল নিশিকান্ত দলপতি, শ্রীমন্ত জানা, মাখন শিট প্রমুখ। এদের নামে ডায়েরি করা সত্ত্বেও থানা নিষ্ক্রিয়। ভগবানপুর এলাকায় ভূপতিনগরে এস ইউ সি আই (সি) কর্মী কমরেড হরেকৃষ্ণ মাইতি গ্রামসভায় প্রার্থী হওয়ার জন্য ৩০ মে মনোনয়নপত্র তোলেন। পরদিন সকালে মাধাখালির বাজারে নিজের দোকানে যখন হরেকৃষ্ণ মাইতি বসেছিলেন, তখন তৃণমূল দুষ্কৃতীরা তাদের কার্যালয়ে তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। তৃণমূল নেতা অরবিন্দ মাইতির উপস্থিতিতে তাকে মারধর করা হয়। ঐদিন দুপুরে তিনজন এস ইউ সি আই (সি) কর্মী সুদেব সাউ, শচীন জানা ও সত্যবান মাইতি ব্লক অফিস থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে বেরিয়ে আসার সময় তৃণমূলের দ্বারা আক্রান্ত হন। দুষ্কৃতীরা তাদের মনোনয়নপত্র ছিঁড়ে দেয়। এই ঘটনা জানানো সত্ত্বেও পুলিশ তৃণমূল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি।

হরিয়ানায় কৃষক-খেতমজুরদের বিক্ষোভ

কৃষিক্ষেত্রে ক্রমাগত ভর্তুকি কমানো, ডিজেল-সারের মূল্যবৃদ্ধি, সেচের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের অভাব, সেজ-এর নামে কৃষিজমি অধিগ্রহণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে এবং গমের কুইন্টাল প্রতি ২৫০ টাকা বোনাস, ফসলের লাভজনক দাম, কৃষকদের ঋণের ফাঁদ থেকে মুক্তির দাবিতে হরিয়ানার রোহতকে আন্দোলন চলছে। গত ৬ মে অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের (এ আই কে কে এম এস) নেতৃত্বে উপরোক্ত দাবির ভিত্তিতে এক মিছিল রোহতকের ছোটুরাম পার্ক থেকে সচিবালয়ে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পরে সংগঠনের প্রতিনিধিরা হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত দাবিপত্রটি রোহতকের সহকারী সচিবের কাছে পেশ করেন। এই বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন এ আই কে কে এম এস-এর হরিয়ানা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড বিজয়কুমার এবং সভাপতি কমরেড অনুপ সিংহ।

দিল্লিতে শিশুকন্যার উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে ২১ এপ্রিল হরিয়ানার রেওয়ারিতে বিক্ষোভ

গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করতে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করুন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in